জুলভার্ন

মাস্টার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড

খসরু চৌধুরী

মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৫

এক

এ কাহিনী পড়ে যদি কারও মনে হয়, নিজের কথাই বক বক করেছি শুধু, তাহলে কিছু করার নেই। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছিলাম ভীষণ অদ্ভুত কিছু ঘটনার সাথে। মাঝে মাঝে ভাবি, ঘটনাটা কি সত্যিই ঘটেছিল?

আমি ওয়াশিংটনের ফেডারাল পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একজন হেড ইন্সপেক্টর। রহস্যের প্রতি আকর্ষণ আমার শৈশব থেকেই। রহস্যময় যে কোন কিছু আমাকে টানত। সরকার গোপন তদন্তের ভার প্রায়ই আমার ওপর চাপিয়ে দিত। সুতরাং এই অদ্ভুত ঘটনার তদন্তের ভারও যে আমার ওপর চাপবে, এতে অবাক হবার কিছু নেই।

দরকারী একটা কথা বলে নেয়া ভাল। এ কাহিনী বিস্ময়কর। বহু ঘটনা কাগজে কলমে প্রমাণ করতে পারব না আমি। আশাকরি এ কাহিনী যাঁরা পড়বেন, তাঁরা বিশ্বাস করবেন। আর যদি না করেন, তাহলে কি আর করার? ঘটনাটা যে কখনও-সখনও আমার নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকে!

আমেরিকার উত্তর ক্যারোলিনার পশ্চিম অঞ্চলে অদ্ভুত এ কাহিনীর সূত্রপাত। এখানকার ব্লুরিজ পর্বতমালার মধ্যেই একটা শৃঙ্গ—গ্রেট আইরী। ক্যাটঅবা নদীর তীরে অবস্থিত ছোট্ট শহর মরগ্যানটন থেকে স্পষ্ট দেখা যায় প্রকাণ্ড গোলাকার পাহাড়টাকে।

পাহাড়টার নাম গ্রেট আইরী হলো কেন, ঠিক বলতে পারব না। পাহাড়টা একেবারে আক্ষরিক অর্থেই পাহাড়। পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই। চূড়োটা এত খাড়া যে, ওঠা প্রায় অসম্ভব। আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে কোন কোন সময় গোটা পাহাড়টা অদ্ভুত এক নীল রঙ ধারণ করে।

চারপাশে বিশাল ডানা মেলে ওড়ে শিকারী পাখির দল। ঈগল, কণ্ডর, শকুন। পাহাড়টা তাদের আস্তানা।

কিন্তু ইদানীং পাহাড়টা আর পাখিদের আকর্ষণ করছে না। সবাই দেখেছে, পাখিগুলো শিখরের চারপাশে চক্কর দেয়। তারপর হঠাৎ কর্কশ চিৎকার করতে করতে ডানা ঝটপটিয়ে অন্যদিকে পালিয়ে যায়।

পাহাড়টাকে গ্রেট আইরী না বলে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বললেই যেন ভাল হত। খাড়া গোল দেয়ালগুলোর মাঝে হয়তো বা বিশাল একটা গর্ত আছে। সেখানে বড়সড় একটা সরোবর থাকাও বিচিত্র নয়। আপ্পালাচিয়ান পর্বতমালার কোন কোন অঞ্চলে বৃষ্টি আর শীতের তুষার মিলে এমনি অগভীর হ্রদের সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

গ্রেট আইরী আসলে একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি কিনা তাই বা কে জানে! অনেকদিন ধরে হয়তো ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু মন্টপিলি বা মাউন্ট ক্রাকাতোয়ার মত যে কোন সময় জেগে উঠে ঘটাতে পারে প্রলয়ঙ্করী কাণ্ড। জমে থাকা পানি পাথরের

ফাঁক দিয়ে ভেতরের আগুনে পড়লেই সাথে সাথে বাষ্প হয়ে যাবে। তারপর বের হবার কোন রাস্তা না পেয়ে ঘটাবে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। ক্যারোলিনার চমৎকার দৃশ্যাবলী পরিণত হবে উত্তপ্ত লাভা আর পাথরের নদীতে। ১৯০২ সালে মার্টিনিকে তো এমন একটা কাণ্ডই ঘটেছিল।

ইদানীং কিছু কিছু লক্ষণও দেখা গেছে। সেগুলো অগ্ন্যুৎপাতের লক্ষণ বলেই মনে হয়। পাহাড়ের মাথায় ধোঁয়ার মেঘ দেখা গেছে। এখানকার লোকেরা পাহাড়টার পাশ দিয়ে যেতে অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেয়েছে। পাহাড়ের একেবারে মাঝখান থেকে ভেসে আসে একটা গুম গুম শব্দ। রাতে চুড়ো ঘিরে দেখা যায় আগুনের লালাভ শিখা।

বাতাসে ভর করে ধোঁয়ার মেঘ ভেসে গেছে পুবে প্লেজ্যান্ট গার্ডেন গ্রামের দিকে। কয়লা আর ছাই পড়েছে সে মেঘ থেকে। তারপর এক ঝড়ো রাতে চুড়োর ওপর জমে থাকা মেঘে প্রতিফলিত হয়েছে আগুনের ফিকে আভা। দৃশ্যটা এমন এক ধরনের, দেখে সবার গা ছম ছম করে উঠেছে।

এইসব অদ্ভুত ঘটনার ফলে আশপাশের এলাকাগুলোতেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। সেই সাথে যোগ হলো কৌতূহল। ক্যারোলিনার সংবাদপত্রগুলোতে গরম হেডলাইন বেরোল—গ্রেট আইরীর রহস্য।

গ্রেট আইরীর ধারে কাছে থাকা নিরাপদ কিনা, এ বিষয়ে লেখালেখি চলতে লাগল। এসব লেখার প্রতিক্রিয়া হলো দু'রকম। যারা দূরের অধিবাসী তাদের মনে আরও প্রবল হয়ে উঠল কৌতূহল। কিন্তু যারা গ্রেট আইরীর পাদদেশে বাস করে তারা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। সবচেয়ে বেশি ভয় পেল মরগ্যানটন আর প্লেজ্যান্ট গার্ডেনের মানুষেরা।

গ্রেট আইরী জয়ের চেষ্টা এতদিনেও কেন করা হয়নি ভেবে সবার আফসোস হলো। তবে, গ্রেট আইরীর একদম খাড়া গা-ই বোধহয় পর্বতারোহীদের অনীহার কারণ। কোন দিক থেকে কোন পথ নেই। তবু, এখন, ক্যারোলিনার পশ্চিমাঞ্চল যখন ভয়াবহ হুমকির মুখোমুখি, যেমন করেই হোক পাহাড়টাতে অনুসন্ধানের একটা ব্যবস্থা তো করতেই হয়।

জ্বালামুখ অনুসন্ধান করার নানারকম ঝক্কি ঝামেলা আছে। তবে, এসবের মধ্যে না গিয়েও একটা বুদ্ধি অবশ্য আছে এখনও।

সে বছর সেপ্টেম্বরের শুরুতেই বেলুনসহ মরগ্যানটন থেকে এসে হাজির হলেন বিখ্যাত নভোচারী উইলকার। পুবদিক থেকে বয়ে আসা বাতাসের অপেক্ষায় থাকলেন তিনি। বাতাসের অনুকূলে অনেক ওপর দিয়ে চুড়ো পার হবার সময় দূরবীন দিয়ে দেখবেন গ্রেট আইরীর একেবারে ভেতর পর্যন্ত। তাহলেই জানা যাবে পাহাড়ের তলা ফাটিয়ে কোন আগ্নেয়গিরি উঁকি দিয়েছে কিনা। এটাই মূল প্রশ্ন। এর উত্তরের ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। অগ্ন্যুৎপাত যদি হয়ও, সেটা এখনই হবে না দেরি আছে, জানা যাবে সেটাও।

যথাসময়ে বেলুন উড়ল আকাশে। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। সূর্যালোকের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে ভোরের মেঘগুলোও। জ্বালামুখেরও ভেতরে ধোঁয়া জমাট বেঁধে না থাকলে তলা পর্যন্ত দেখে নিতে পারবেন উইলকার।

আর বাষ্প উঠলে বুঝতে পারবেন, কোথা থেকে উঠছে সে বাষ্প।

দেখতে দেখতে ১৫০০ ফুট ওপরে উঠে গেল বেলুন। তারপর একবারে স্থির হয়ে থাকল মিনিট পনেরো। অনেক নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বাতাস। অত ওপরে সে বাতাসের বেগ ঠাহর করা যাচ্ছে না কিছুই। হঠাৎ ঘটল দুর্ঘটনা। উল্টোদিক থেকে বাতাসের ধাক্কায় সাঁ সাঁ করে পুবদিকে উড়ে চলল বেলুন। ক্রমেই গ্রেট আইরীর সাথে দূরত্ব বাড়তে লাগল। বেলুনটা থামানোর অনেক চেষ্টা করলেন উইলকার। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মরগ্যানটনের অধিবাসীদের চোখের সম্মুখ থেকে উধাও হয়ে গেল বেলুনটা। পরে জানা গেল, বেলুনটা পড়েছে নর্থ ক্যারোলিনার রাজধানী র‍্যালের কাছে।

চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, সেটা বুঝল সবাই। বলাবলি করতে লাগল, আবার নতুন করে চেষ্টা করতে হবে।

ইতোমধ্যে আবার গুমগুম শব্দ আসতে লাগল পাহাড়ের ভেতর থেকে। জ্বালামুখের কাছের আকাশ লাল টকটকে হয়ে উঠতে লাগল। অধিবাসীরা সবাই ভূমিকম্প আর অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ে ভীত হয়ে উঠল।

পরের বছর এপ্রিলের গোড়ার দিকে মৃদু ভীতি পরিণত হলো আতঙ্কে। খবরের কাগজগুলো আবার সে আতঙ্কে ইন্ধন যোগাতে লাগল। পাহাড় আর মরগ্যানটনের মাঝামাঝি অঞ্চলের সমস্ত জনসাধারণ আতঙ্কে কাঠ হয়ে রইল। যে কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত।

৪ এপ্রিল রাতে ভীষণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল প্লেজ্যান্ট গার্ডেনের নিরীহ অধিবাসীদের। প্রথমে তাদের মনে হলো, মাথার ওপর পাহাড়টা ভেঙে পড়ছে। সবাই ছুটে বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে। মনে আশঙ্কা, বাইরেই হয়তো দেখবে, বিশাল জায়গা জুড়ে গভীর গহ্বর। তার ভেতরে অদৃশ্য হয়েছে খেত-খামার!

নিকষ কালো রাত। ভারি মেঘ এমনভাবে ঝুলে আছে প্রান্তরের ওপর, মনে হয়, দিনের বেলা হলেও সে মেঘ ফুঁড়ে পাহাড়টার বিন্দুমাত্র দেখা যেত না।

পাগলের মত সবাই ছোটাছুটি করছে নিরেট সেই আঁধারের ভেতর। চিৎকার করছে সবাই, কিন্তু একজন আরেকজনের কথার জবাব দিচ্ছে না। টুকরো টুকরো চিৎকার ভেসে আসছে—'ভূমিকম্প!', 'অগ্ন্যুৎপাত!,' 'কোথায়?', 'কোথায়?', 'গ্রেট আইরীতে।'

মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল—পাথর, ছাই আর লাভার স্রোত ধেয়ে আসছে মরগ্যানটনের দিকে।

শহরের বুদ্ধিমান অধিবাসীরা অবশ্য এসব গুজবে কান দিল না। অগ্ন্যুৎপাত হলে তো শব্দ ক্রমেই বাড়তে থাকবে। জ্বালামুখের বাইরে আগুনের শিখা দেখা যাবে। কিন্তু সে রকম আলো বা আওয়াজ তো পাওয়া যাচ্ছে না। ভূমিকম্পও তো হয়নি। হয়তো চূড়া থেকে বিরাট কোন পাথর গড়িয়ে পড়ার ফলেই চারদিকটা এমন কেঁপে উঠেছে।

ভালয় ভালয় কাটল ঘণ্টাখানেক। ব্লুরিজের ওপর দিয়ে বয়ে গেল পশ্চিমের বাতাস। উঁচু পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে এল পাইন আর হেমলকের মর্মরধ্বনি। মনে হলো, আর কোন ভয় নেই। পালিয়ে যাওয়া মানুষগুলো আবার ফিরতে লাগল

ঘরে। অস্থির হয়ে রইল কখন হবে ভোর।

রাত তিনটের দিকে ঘটল আরেক ঘটনা। গ্রেট আইরীর পাথুরে শরীর বেয়ে ঝাঁপিয়ে উঠল অগ্নিশিখা। অনেকদূর পর্যন্ত মেঘ, আশপাশের এলাকা আগুনের আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পট পট করে একটা শব্দ শোনা গেল। যেন গাছ পুড়ছে দাবানলে।

আগুন কি আপনা-আপনি জ্বলে উঠেছে? কিন্তু কিভাবে? বজ্রপাতের ফলে এটা ঘটতে পারে না। কারণ, বজ্রপাতের কোন শব্দ পাওয়া যায়নি। আশপাশে অবশ্য প্রচুর দাহ্য পদার্থ আছে। ব্লুরিজের ওপর দিকে গাছ-পালারও অভাব নেই। কিন্তু এই আগুন তো ধীরে ধীরে জ্বলে ওঠেনি। জ্বলে উঠেছে একবারে।

'অগ্ন্যুৎপাত! অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়েছে!'

আতঙ্কিত শোরগোল ভেসে এল চারদিক থেকে। গ্রেট আইরী তাহলে সত্যিই একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। বহু দিন, বহু বছর পর জেগে উঠেছে আবার। এখনই কি বন্যার মত নেমে আসবে ছাই আর গলিত লাভা? গড়িয়ে যাবার পথে যা পাবে—শহর, গ্রাম, খামার, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, মাঠ, বন, এমন কি প্লেজ্যান্ট গার্ডেন এবং মরগ্যানটনকেও শেষ করে দেবে?

এবারকার আতঙ্কের রাশ আর টেনে ধরা গেল না। মায়েরা বাচ্চা কোলে কাঁপতে কাঁপতে ছুটল পুবের রাস্তা ধরে। দামী জিনিসপত্রগুলো কোনরকমে পোঁটলা করে বেঁধে পুরুষেরাও ছুটল বাড়িঘর ছেড়ে। আসার আগে বাঁধন খুলে দিল পোষা জন্তুগুলোর। গরু, ভেড়া, শুয়োর ছুটে চলে গেল যার যেদিকে ইচ্ছে। গাঢ় অন্ধকারের মাঝে সে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। ছুটোছুটি করছে সবাই, কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। মাথার ওপরে আগ্নেয়গিরির আগুন, এদিকে পাশেই জলাভূমি। যে কোন মুহূর্তে পানি ফেঁপে উঠে ভাসিয়ে দিতে পারে চারদিক। পায়ের তলা থেকে মাটিই যে হঠাৎ সরে যাবে না, তাই বা কে বলতে পারে! তাছাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে যদি নামতে থাকে লাভার স্রোত, তাহলে তো পালাবার পথই থাকবে না।

তবু, এর মধ্যেও, সাহসী কিছু লোক পালানোর এ গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিল না। বরং পলায়মান জনতাকে থামানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল। পাহাড় থেকে মাইল খানেক তফাতে এসে তারা দেখল, আগুনের তাপ অনেকটা কমে এসেছে। কোথাও পাথর ছিটকে পড়ছে না। লাভার স্রোতও নেমে আসছে না ঢাল বেয়ে। এমনকি পায়ের নিচ থেকেও ভেসে আসছে না কোন গুম গুম শব্দ। অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা আর নেই বললেই চলে। আশপাশের এলাকা বোধহয় বেঁচে গেল একটা প্রলয়ের হাত থেকে।

ওদিকে অনেকটা দৌড়ানোর পর একটা নিরাপদ দূরত্বে এসে থামল গ্রামবাসীরা। কিছুক্ষণ পর তাদের কেউ কেউ সাহসে বুক বেঁধে আবার ফিরে চলল পাহাড়ের দিকে। তাদের দেখাদেখি আরও কয়েকজন। ভোরের আগে অনেকেই ফিরল আপন আপন ঘরে।

পরে সব দেখে বোঝা গেল, আসলে কোন অগ্ন্যুৎপাতই হয়নি। মনে হলো, ভবিষ্যতেও গ্রেট আইরীতে কখনও অগ্ন্যুৎপাত বা ভূমিকম্প হবে না। তবু, এরপরেও

ঘটনা ঘটল।

ভোর পাঁচটা। তখনও ছিটেফোঁটা আঁধার চারদিকে। হঠাৎ বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ করে একটা শব্দ। যেন শক্তিশালী ডানা ঝাপটাচ্ছে বিশাল কোন পাখি। দিনের বেলা হলে কৃষকেরা হয়তো দেখতে পেত, গ্রেট আইরীর অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এল দানবের মত বিশাল এক শিকারী পাখি। ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল পুব দিকে।

দুই

গতরাতে ওয়াশিংটন থেকে রওনা দিয়ে নর্থ ক্যারোলিনার রাজধানী র‍্যালেতে পৌঁছলাম ২৭ এপ্রিল।

দু'দিন আগে ফেডারাল পুলিশ প্রধান আমাকে তাঁর ঘরে ডেকেছিলেন। ঘরে ঢুকেই বুঝলাম, তিনি অস্থির হয়ে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'জন স্ট্রক, আগে বহুবার দেখেছি, কাজের প্রতি তুমি খুব বিশ্বস্ত। কঠিন কাজ করতে তোমার জুড়ি নেই। এখনও কি তুমি তেমন আছ?'

বাউ করে বললাম, 'মি. ওয়ার্ড, সফলতার কথা বলতে পারব না। তবে কাজে নামলে বিশ্বস্ততার অভাব হবে না, এটা বলতে পারি।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বললেন চীফ। 'যাক। এবার আসল কথাটা বলে ফেলি। রহস্যের প্রতি তোমার আগ্রহ কি এখনও আগের মতই আছে? রহস্য এখনও ভালবাস?'

'অবশ্যই।'

'বেশ বেশ। তাহলে শোনো।'

মি. ওয়ার্ডের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। শারীরিক ও মানসিক দু'দিক থেকেই যথেষ্ট শক্তিশালী। যে গুরুত্বপূর্ণ পদটি তিনি দখল করে আছেন, তার জন্যে তিনি খুবই যোগ্য ব্যক্তি। আমাকে বেশ কয়েকবার গুরুত্বপূর্ণ মিশনে পাঠিয়েছেন তিনি। প্রত্যেকটাতেই সফল হয়েছি। এতে আমার উপর তাঁর আস্থা বেড়েছে। গত কয়েকমাস তিনি আমাকে কোন কাজ দিতে পারেননি। আমারও তাই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া কিছু করার ছিল না। তাই অধীর আগ্রহে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। গুরুতর কিছু ঘটেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তিনি বললেন, 'ব্লুরিজ মাউন্টেনসে যে কাণ্ড হয়েছে, সে সম্পর্কে নিশ্চয় জানো।'

'হ্যাঁ। অদ্ভুত ঘটনা। যে কোন মানুষকে কৌতূহলী করার পক্ষে যথেষ্ট।'

'শুধু অদ্ভুত নয়। অসাধারণ। কিন্তু ওখানে সত্যি সত্যি বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে কিনা, সেটা আমাদের দেখা দরকার। জানা দরকার, ওখানকার অধিবাসীরা আরও কোন বিপদে বা রহস্যে জড়িয়ে পড়তে চলেছে কি না।'

'হ্যাঁ। যেসব ঘটনা ওখানে ঘটে গেল, তাতে ভয় পাবার কারণ আছে, স্যার।'

'সুতরাং ওই পাহাড়ের মধ্যে কি আছে, তা আমাদের জানতেই হবে। যদি

দেখা যায় প্রকৃতির বিশাল শক্তির কাছে আমরা অসহায়, তাহলে সময় থাকতেই গ্রামবাসীদের সাবধান করে দিতে হবে। বাঁচাতে হবে তাদের আসন্ন বিপদ থেকে।'

'নিশ্চয়। এটা তো আমাদেরই দায়িত্ব। পাহাড়ের মধ্যে কি কাণ্ড ঘটছে সেটা আমাদের অবশ্যই জানা দরকার।'

'ঠিক বলেছ, স্ট্রক। কিন্তু এতে অনেক অসুবিধেও আছে। সবাই বলছে, খাড়া গা বেয়ে উঠে ভেতরে ঢোকা নাকি কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু সময় সুযোগ বুঝে, আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে আজ পর্যন্ত কি কেউ ওখানে ওঠার চেষ্টা করেছে? এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। তাই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সত্যি সত্যি যদি কেউ গ্রেট আইরীতে উঠতে চায়, তাহলে ব্যাপারটা অসম্ভব হবে না।'

'পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই, মি. ওয়ার্ড। তবে, কিছু খরচাপাতির ব্যাপার আছে, এই যা।'

'ওখানকার সারা এলাকা জুড়ে লোকজন আতঙ্কে কাঠ হয়ে আছে। ওদের মনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে যে-কোন খরচা করব আমরা। আরেকটা কথা আমার মনে হচ্ছে। গ্রেট আইরীকে যত দুর্ভেদ্য ভাবা হচ্ছে, আসলে হয়তো মোটেও তা নয়। হয়তো ওখানে ঢোকার গোপন কোন পথ আছে। সেই পথের সন্ধান পেয়ে একদল শয়তান হয়তো ওখানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে।'

'বলেন কি! ডাকাতদের আড্ডা—'

'আমার ভুলও হতে পারে, স্ট্রক। অদ্ভুত এইসব শব্দ আর আলোর পেছনে হয়তো মানুষের কোন হাতই নেই। সবই প্রাকৃতিক ব্যাপার। যাই হোক, আমরা জানতে চাই ওখানে সত্যি সত্যি কি ঘটছে। এবং তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

'বলো।'

'গ্রেট আইরীর ভেতরে ঢুকে যদি বোঝা যায়, সত্যি সত্যি একটা অগ্ন্যুৎপাত হতে চলেছে, তাহলে কিভাবে তা ঠেকানো যাবে?'

'না, স্ট্রক। অগ্ন্যুৎপাত ঠেকানো আমাদের সাধ্যের বাইরে। তবে বিপদটা কতখানি, সেটা নিশ্চয় আন্দাজ করা যাবে। মাউন্ট পিলির লাভার নিচে চাপা পড়েছিল মার্টিনিক। যদি দেখা যায়, গ্রেট আইরীও একই কাণ্ড ঘটাতে চলেছে নর্থ ক্যারোলিনায়, তাহলে লোকজনকে সরিয়ে নিতে হবে ওখান থেকে।'

'স্যার, মনে হয় অতখানি সাংঘাতিক কিছু ঘটবে না।'

'হুম। আমারও তাই মনে হয়। ব্লুরিজ পর্বতমালার মধ্যে কোন আগ্নেয়গিরি থাকতেই পারে না। আপ্পালাচিয়ান পর্বতমালার ইতিহাসে কোন আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এতসব ঘটনা নিশ্চয় বিনা কারণে ঘটছে না। তাই ঠিক করেছি, ওখানে জোর তদন্ত চালাব। শহর এবং গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করে জানতে হবে, ওখানে কেন অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয়েছে। এই কাজের জন্যে পুরো আস্থা রাখা যায়, এমন একজন এজেন্ট আমাদের দরকার। আর, সে হলে তুমি।'

'ধন্যবাদ। আমি রেডি, স্যার,' সোল্লাসে বললাম আমি, 'কথা দিচ্ছি, সম্পূর্ণ তথ্য যোগাড় করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

'জানি। এ কাজের জন্যে তুমিই সবচেয়ে যোগ্য, স্ট্রক। রহস্য তুমি ভালবাস।

আশা করি, তোমার রহস্য পিপাসু মনটা এ কাজ করতে প্রচুর আনন্দ পাবে।'

'যা বলেন, স্যার।'

'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করো। এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে তোমার। যদি মনে করো একদল পর্বতারোহী দরকার তবু পিছপা হয়ো না। খরচাপাতির ব্যাপারে কোন চিন্তা করবে না।'

'যা ভাল বুঝব তাই করব, স্যার।'

'সাবধান! পরিস্থিতি যাই হোক, চোখ খোলা রেখে চলবে। ওখানকার সবাই অত্যন্ত উত্তেজিত। তাই, তদন্ত যতটা গোপনে করা যায় ততই ভাল। একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখবে, নতুন কোন আতঙ্ক যেন আবার মাথাচাড়া না দেয়।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'মরগ্যানটনের মেয়র তোমাকে সবরকম সাহায্য করবে। আবার বলছি, খুব মাথা খাটিয়ে চলবে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন তোমার মিশন সম্পর্কে জানতে না পারে। তোমার বিচার বুদ্ধির অনেক প্রমাণ আমি পেয়েছি। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সফল তুমি হবেই।'

জানতে চাইলাম, 'কখন রওনা হব?'

'আগামীকাল।'

'ঠিক আছে। আগামীকালই রওনা হব ওয়াশিংটন থেকে। পরশু পৌঁছুব মরগ্যানটন।'

তখন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি কতখানি বিস্ময় আমার জন্যে ওৎ পেতে আছে।

বাড়ি ফিরলাম। যাত্রার জন্যে যা গোছগাছ করার দরকার, করলাম। পরদিন সন্ধ্যায় পৌঁছলাম র‍্যালে। রাতটাও কাটালাম ওখানেই। তার পরদিন বিকেলের দিকে পৌঁছলাম মরগ্যানটন স্টেশনে।

ছোটখাট শহর মরগ্যানটন। এখানে জুরাসিক যুগের ভূস্তর আছে। ফলে কয়লা পাওয়া যায় প্রচুর। কয়লাখনিগুলো শহরটাতে সমৃদ্ধিও এনে দিয়েছে। সারা শহর জুড়ে বয়ে গেছে অনেক খনিজ জলস্রোত। এগুলো ট্যুরিস্টদের খুব আকর্ষণ করে। এখানকার মাটি খুবই উর্বর। শহরের চারপাশ জুড়ে বিস্তৃত শস্যখেত। এসব ছাড়াও আছে শ্যাওলা আর নলখাগড়া বোঝাই জলাভূমি। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে গেছে চিরহরিৎ বন। এখানে অনেক কিছুই আছে। নেই শুধু গ্যাস, যা অ্যালেঘানি উপত্যকার প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। অথচ গ্যাসই হলো শক্তি, আলো আর উত্তাপের উৎস। পাহাড়ী বনের প্রান্ত ঘেঁষে অজস্র গ্রাম ও খামার বাড়ি। সুতরাং যদি দেখা যায় গ্রেট আইরী আসলেই একটা আগ্নেয়গিরি, অগ্ন্যুৎপাতও আসন্ন, তাহলে প্লেজ্যান্ট গার্ডেন থেকে মরগ্যানটন পর্যন্ত বসবাসকারী বহু লোক সত্যিই ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন।

মরগ্যানটনের মেয়রের নাম মি. ইলিয়াস স্মিথ। চল্লিশ বা তার কিছু বেশি বয়স হবে। লম্বা, সবল, সাহসী চেহারা। স্বাস্থ্য বটে ভদ্রলোকের। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার তাবৎ ডাক্তার মিলেও তাঁর কোন অসুখ বের করতে পারবে বলে মনে হয় না। তিনি ভালুক আর চিতাবাঘ শিকারে ওস্তাদ। অ্যালেঘানির ঘন বন ও

গিরিসঙ্কটে এসব জন্তু এখনও পাওয়া যায়।

মি. স্মিথ নিজে একজন জমিদার। আশপাশে তাঁর অনেকগুলো খামার বাড়ি আছে। সবচেয়ে দূরের প্রজার বাড়িতেও তিনি প্রায়ই যান। সরকারী কাজ হাতে না থাকলেই তিনি মরগ্যানটন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। শিকারের নেশায় তোলপাড় করে ফেরেন বনজঙ্গল।

মি. স্মিথের বাড়ি গিয়েই উঠলাম আমি। টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ফর্মালিটির ধার না ধেরে একান্ত ঘরোয়াভাবে আমাকে আপ্যায়ন করলেন। তাঁর মুখে পাইপ। সামনের টেবিলের ওপর ব্র্যান্ডির গ্লাস। আমাকে দেখেই চাকর মারফত দ্বিতীয় গ্লাস আনালেন। প্রথমে ব্র্যান্ডি খেলাম আমরা। তারপর শুরু হলো কথাবার্তা।

হালকা স্বরে তিনি বললেন, 'আপনাকে তো মি. ওয়ার্ড পাঠিয়েছেন, তাই না? আসুন, তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করি।'

পুলিশ প্রধানের সম্মানার্থে আরেক দফা ব্র্যান্ডি খাওয়া হলো।

'এবার বলুন,' কাজের কথায় এলেন মি. স্মিথ, 'তাঁর দুশ্চিন্তার কারণটা কি?'

মেয়রকে নর্থ ক্যারোলিনা মিশন সম্বন্ধে সবকিছু খুলে বললাম। আমাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, সে কথাও বাদ দিলাম না। গ্রেট আইরীর ধাঁধার জট খুলতেই হবে। এখানকার জনসাধারণের আতঙ্ক দূর করতে মি. ওয়ার্ড সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মাঝে মাঝে শুধু ব্র্যান্ডির গ্লাস ভরে দেয়া ছাড়া একটা কথাও বললেন না মি. স্মিথ। পাইপ টানতে টানতে কখনও কখনও তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল। কখনও ভুরুর নিচে জ্বলজ্বল করে উঠল চোখ। কতখানি মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছেন, তা বলাই বাহুল্য। বুঝলাম, গ্রেট আইরীর ঘটনায় তিনিও চিন্তিত। এই রহস্য ভেদ করতে তিনিও আমার মতই আগ্রহী।

কথা শেষ হলে কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর খুব নিচু স্বরে বললেন, 'হুঁ। টনক নড়েছে তাহলে। ওয়াশিংটনের ওঁরাও জানতে চান, গ্রেট আইরীর মধ্যে কি ঘটছে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি? আপনিও তাই চান নাকি?'

'অবশ্যই।'

'আমিও তাই চাই।'

ঠক ঠক করে পাইপ ঠুকে পোড়া ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি বললেন, 'আমার অবস্থাটা আপনি বুঝবেন। জমিদার হিসেবে গ্রেট আইরীর ঘটনায় খুব আগ্রহী হয়ে পড়েছি। এদিকে মেয়র হিসেবে জনসাধারণকে রক্ষা করাও আমার কর্তব্য।'

'এইসব অসাধারণ কাণ্ড কারখানার সমাধান করার পেছনে আপনার তাহলে দুটো উদ্দেশ্য আছে,' বললাম আমি। 'মাই ডিয়ার মি. স্মিথ, এ ব্যাপারে তো আপনার কোন সন্দেহ নেই যে, গ্রেট আইরীর রহস্য যেমন ব্যাখ্যার অসাধ্য, তেমনি জনসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনকও বটে।'

'ব্যাখ্যার অসাধ্য, হ্যাঁ, তা বলতে পারেন, মি. স্ট্রক, কারণ, আমি বিশ্বাস করি

না, গ্রেট আইরী একটা আগ্নেয়গিরি। অ্যালেঘানির ইতিহাসে কোন আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া যায় না। আমাদের এলাকায় কোন লাভা বা আগ্নেয় পাথর আমি কখনও দেখিনি। সুতরাং মরগ্যানটনে অগ্ন্যুৎপাত হবে, তা আমি মনে করি না।'

'আপনি কি সত্যিই তাই মনে করেন?'

'নিশ্চয়।'

'কিন্তু পায়ের তলায় মাটি কেঁপে ওঠাটা সবাই অনুভব করেছিল।'

'মাটি কেঁপেছিল!' মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন মি. স্মিথ। 'মাটি কি সত্যিই কেঁপেছিল? আগুনের শিখা যখন তীব্র হয়ে ওঠে, আমি তখন গ্রেট আইরী থেকে মাত্র এক মাইল দূরে। উইলডন খামার বাড়িতে। বাতাসে একটা কাঁপন জেগেছিল। কিন্তু মাটি কেঁপেছিল এমন তো একবারও মনে হয়নি।'

'কিন্তু মি. ওয়ার্ডের কাছে পাঠানো রিপোর্টে—'

'রাখুন আপনার রিপোর্ট,' বাধা দিলেন মেয়র। 'ওসব তৈরি করা হয়েছে লোক-জনের আতঙ্কের ওপর নির্ভর করে। আমার রিপোর্টে আমি মাটি কাঁপার কথা কিছুই লিখিনি।'

'কিন্তু আগুনের শিখা চুড়ো ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠেছিল কেন?'

'হ্যাঁ, এই প্রশ্ন আপনি করতে পারেন, মি. স্ট্রক। আগুন আমি নিজের চোখে দেখেছি। মাইলখানেক জুড়ে মেঘ লাল টকটকে হয়ে উঠেছিল আগুনের আভায়। তাছাড়া গ্রেট আইরীর ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দও ভেসে আসছিল। বিরাট একটা বয়লার যেন বাষ্প ছাড়ছে হিস হিস করে।'

'এ ঘটনার কোন সাক্ষী আছে?'

'আছে বৈকি। আমার দুই কান।'

'তাহলে সবচেয়ে রহস্যময় শব্দটাও কি আপনি শুনেছেন? বিশাল ডানা ঝাপটানোর মত কোন শব্দ?'

'হ্যাঁ। শুনেছিলাম বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু আগুন নিভে যাবার পর উড়ে যাওয়া কোন্ পাখির অভ্যাস, তা জানি না। আর ওরকম প্রচণ্ড শব্দ কোন্ প্রকাণ্ড পাখির হতে পারে, তা-ও জানি না। তাই তো ভাবি, যা দেখেছি, শুনেছি, সবই হয়তো চোখ বা কানের ভুল। দানব কোন পাখি গ্রেট আইরীতে বাসা বেঁধেছে, এ কি সম্ভব! যদি তাই হত তাহলে অনেক আগেই তো তাদের দেখতে পাবার কথা। পাথুরে বাসার চারপাশে নিশ্চয় তারা উড়ে বেড়াত। না, এই রহস্যের সমাধান করা সত্যিই খুব কঠিন।'

'কিন্তু আপনি যদি সাহায্য করেন, তাহলে এই রহস্যের জট আমরা খুলবই, মি. স্মিথ।'

'আমার সবরকম সাহায্য আপনি পাবেন। তাহলে কাল থেকেই কাজ শুরু করা যাক, কি বলেন?'

'হ্যাঁ। কাল থেকেই,' বলে মেয়রের কাছ থেকে বিদায় নিলাম আমি।

তারপর একটা হোটেলে উঠে বেশ কিছুদিনের জন্যে সীট বুক করে, খাওয়া দাওয়া সেরে একটা চিঠি লিখলাম মি. ওয়ার্ডকে। বিকেলে আবার দেখা করলাম মি. স্মিথের সাথে। পরদিন ভোর হতেই যাতে বেরিয়ে পড়তে পারি, সেইরকম বন্দোবস্ত

হলো।

আমাদের প্রথম কাজ হলো, অভিজ্ঞ দু'জন গাইডকে নিয়ে পাহাড়ের চুড়োয় ওঠা। যোগাড়ও হয়ে গেল গাইড। মি. মিচেল ও অন্যান্য পর্বতারোহীগণ যখন ব্লুরিজের সর্বোচ্চ শৃঙ্গগুলো জয় করেছিলেন, তখন তাঁদের সাথে এই দু'জনই ছিল গাইড হিসেবে। তবে এদের কেউই গ্রেট আইরীতে ওঠার চেষ্টা করেনি। তারা জানে, দু'পাশের পাথুরে পাঁচিল এত বেশি খাড়া যে, ওঠা অসম্ভব। তাছাড়া, এসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটার আগে গ্রেট আইরী ট্যুরিস্টদের কাছে মোটেই আকর্ষণীয় জায়গা ছিল না।

দু'জন গাইডকেই মি. স্মিথ ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। দু'জনেই দুঃসাহসী, অভিজ্ঞ এবং বিশ্বস্ত। কোন বাধাকেই তারা বাধা মনে করে না। আমরা ঠিক করলাম, এদের সাথে নিয়ে এই ঘটনার একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব।

শেষে মি. স্মিথ বললেন যে, গ্রেট আইরীতে ওঠা আগে দুঃসাধ্য হলেও এখন হয়তো অবস্থা বদলেছে।

'কি রকম?' জানতে চাইলাম আমি।

'কিছুদিন আগে বিরাট একটা পাথর খসে পড়েছে পাহাড়ের গা থেকে। হয়তো সেদিক দিয়ে ওঠার বা ভেতরে ঢোকার একটা পথ বেরোবে।'

'সেটা আমাদের সৌভাগ্য।'

'কালকেই সব জানা যাবে।'

'আজ আসি তাহলে। দেখা যাক্ কাল কি হয়।'

তিন

পরদিন খুব ভোরে রওনা দিলাম আমরা। ক্যাটঅবা নদীর বাঁ পাড় বরাবর রাস্তা চলে গেছে প্লেজ্যান্ট গার্ডেন পর্যন্ত। গাইড দু'জন স্থানীয় বাসিন্দা। হ্যারি হর্ন-এর বয়স তিরিশ। জেমস ব্রাক-এর পঁচিশ। ব্লুরিজ আর কামবারল্যান্ড পর্বতমালার চুড়োগুলোতে উঠতে ট্যুরিস্টরা সবসময় এদেরই নিয়ে যায়।

তেজী দুটো ঘোড়া আমাদের হালকা গাড়িটাকে টেনে নিয়ে চলল। পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত যাওয়া যাবে এই গাড়িতেই। দু'তিনদিনের জন্যে পর্যাপ্ত খাবার আছে গাড়িতে। মাংস আর মদ কোনটাই নিতে কার্পণ্য করেননি মি. স্মিথ। দু' তিনদিনের বেশি থাকার দরকার হবে বলেও মনে হয় না। খাবার পানিরও অভাব নেই। সমস্ত এলাকাতেই ছড়িয়ে আছে ঝর্ণা। বসন্তকালে ঝর্ণাগুলো ভরে যায় বৃষ্টির পানিতে।

এতকিছুর মধ্যেও মেয়র সাহেব তাঁর শিকারের কথা ভোলেননি। সাথে নিয়েছেন বন্দুক আর কুকুর নিসকোকে। গাড়ির পাশাপাশি আনন্দে ছুটে চলেছে নিসকো। পাহাড়ে ওঠার আগে অবশ্য ওকে রেখে যেতে হবে উইলডনের খামারবাড়িতে। গ্রেট আইরীর খাড়া দেয়াল বেয়ে আমরা উঠতে পারলেও নিসকো তো আর পারবে না।

চমৎকার দিন। এপ্রিলের ভোরের ঠাণ্ডা, তাজা বাতাস বইছে। তুলোর মত কিছু মেঘ শাঁ শাঁ করে উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। সুদূর আটলান্টিক থেকে ভেসে আসছে ঝিরঝিরে বাতাস। বয়ে যাচ্ছে প্রান্তরের ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। সবুজ গাছপালা ঝিকমিক করে হেসে উঠছে।

আমরা যে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছি, তা বিভিন্ন রকম শব্দে মুখরিত। সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছে কাঠবিড়ালী, মেঠো ইঁদুর। উড়ে যাচ্ছে বাহারী রঙের ল্যাজঝোলা তোতা। কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে তাদের ডাকে। থলির মধ্যে বাচ্চা নিয়ে তাড়াহুড়ো করে লাফ দিয়ে পালাচ্ছে অপোসাম। বট, তাল, রডোডেনড্রনের শাখায় নাচানাচি করছে হাজার হাজার পাখি।

প্লেজ্যান্ট গার্ডেনে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। শহরটা প্রায় গ্রামের মতই। এখানকার মেয়র মি. স্মিথের বন্ধু। বিশাল কিছু বীচ গাছের ছায়ায় মেয়র সাহেবের বাড়ি। যত্নের কোন ত্রুটি করলেন না তিনি।

কথা বলতে বলতে অবশ্যম্ভাবীরূপেই একসময় এসে পড়ল গ্রেট আইরীর কথা।

'ঠিক ধরেছেন,' মেয়র বললেন, 'ওটার ভেতর কি লুকিয়ে আছে তা না জানা পর্যন্ত এখানকার মানুষ শান্তি পাবে না।'

আমি জানতে চাইলাম, 'গ্রেট আইরীর মাথায় আগুনের শিখা দেখা যাবার পর নতুন আর কিছু ঘটেছে কি?'

'না, মি. স্ট্রক। প্লেজ্যান্ট গার্ডেন থেকে পাহাড়টার চূড়ো পর্যন্ত দেখা যায়। আর কোন সন্দেহজনক শব্দ শোনা যায়নি। শিখাও আর দেখিনি। যদি কোন শয়তানের দল ওখানে আশ্রয় নিয়ে থাকে তাহলে এতদিনে তারা নিশ্চয় তাদের নারকীয় রান্না-বান্না সেরে অন্য কোথাও গেছে নরক গুলজার করতে।'

'শয়তান!' চেঁচিয়ে উঠলেন মি. স্মিথ। 'বেশ, যদি ওরা রান্না-বান্না করেই থাকে তাহলে সেসবের কিছু অবশিষ্ট অবশ্যই পড়ে আছে। খুর, শিং বা লেজ। সেগুলোই আমরা খুঁজে বের করব।'

পরদিন, ২৯ এপ্রিল, আবার আমরা রওনা দিলাম খুব ভোরে। আশা করি দিনের শেষাশেষি পাহাড়ের পাদদেশে উইলডন খামার বাড়িতে পৌঁছব। দু'পাশের মাঠ-ঘাট একই রকম। শুধু রাস্তা আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠছে। একের পর এক পাওয়া গেল জলাশয় আর জঙ্গল। জলাভূমির সংখ্যা অবশ্য ক্রমেই কমতে লাগল। রোদে শুকিয়ে গেছে। জনবসতিও এখানে হালকা। ছড়ানো ছিটানো ছোট ছোট দু'একটা গ্রাম, গাছের আড়ালে প্রায় অদৃশ্য। নিঃসঙ্গ কিছু খামারবাড়িও চোখে পড়ল। অনেক পাহাড়ী ঝর্ণা বইছে। ঝর্ণাগুলো নিচে গিয়ে মিশেছে ক্যাটঅবা নদীতে।

ছোট ছোট আরও প্রচুর পাখি আর জন্তু দেখলাম আমরা। মি. স্মিথ বললেন, 'হাত নিশপিশ করছে। মনে হচ্ছে এখনি নিসকোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আজই প্রথম তিতির আর খরগোসগুলোকে গুলি না করে ছেড়ে দিলাম। সাথে প্রচুর খাবার দাবার আছে। তাছাড়া, এগুলোর চেয়ে বড় শিকারের পেছনে তাড়া করতে হবে। রহস্য শিকার।'

'হ্যাঁ। আশা করি খালি হাতে ফিরব না।'

বিকেল নামল। আমরা পাহাড়ের মাত্র ছ'মাইলের মধ্যে এসে পড়লাম। সামনে বিস্তৃত গোটা ব্লুরিজ পর্বতমালা। পরিষ্কার আকাশের বুকে আঁকা চুড়োগুলো। পাহাড়ের পাদদেশে ঘন বন থাকলেও চুড়োর কাছটা অনেক পাতলা। এখানে-ওখানে শুধু দু'একটা চিরহরিৎ গাছ। গাছপালা দেখে মনে হয়, বাড়তে বাড়তে হঠাৎ থেমে গেছে। অদ্ভুতভাবে বেঁকে আছে লিকলিকে গাছগুলো। এতে চুড়োর চেহারাটা হয়েছে কিম্ভুত। আমাদের আশপাশ ঘিরে শুধু চুড়োর চোখা চোখা মাথা। ডানদিকে মেঘ ফুঁড়ে উঠে গেছে ৭০০০ ফুট উঁচু ব্ল্যাকডোম।

বললাম, 'মি. স্মিথ, আপনি কি কখনও ব্ল্যাকডোমের চুড়োয় উঠেছেন?'

'না। তবে শুনেছি, ওখানে ওঠা খুবই কঠিন। তাছাড়া উঠলেও নাকি গ্রেট আইরীর ভেতরের কিছুই দেখা যায় না।'

'ঠিক বলেছেন,' বলল গাইড হ্যারি হর্ন। 'আমি নিজেও চেষ্টা করে দেখেছি।'

'আবহাওয়া ভাল ছিল না বোধহয়?' বললাম আমি।

'না। ঠিক তার উল্টো। আবহাওয়া ছিল একেবারে পরিষ্কার। কিন্তু গ্রেট আইরীর খাড়া দেয়াল এমনভাবে উঠে গেছে, ঢাকা পড়েছে ভেতরের সবটুকুই।'

'তাড়াতাড়ি এগোও সবাই,' চিৎকার করে উঠলেন মি. স্মিথ। 'যেখানে কোনদিন মানুষের পা পড়েনি, আমি সেখানে যেতে চাই। দেখতে চাই যা মানুষ কোনদিন দেখেনি।'

একেবারে শান্তভাবে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্রেট আইরী। চুড়ো থেকে বেরোনো ধোঁয়া বা আগুনের শিখা আমাদের চোখে পড়ল না।

পাঁচটা নাগাদ পৌঁছলাম উইলডন খামার বাড়িতে। প্রজারা সাদর অভ্যর্থনা জানাল তাদের জমিদারকে। তারা বলল, বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল, গ্রেট আইরী আর নতুন কোন উৎপাত করেনি। একই টেবিলে সবাই একসাথে বসে খাওয়া-দাওয়া সারলাম। সে রাতে ঘুম হলো খুবই গভীর। ভবিষ্যতের পূর্বাভাস সংক্রান্ত কোন দুঃস্বপ্ন সে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাল না।

পরদিন ভোর হবার আগেই শুরু হলো পর্বতারোহণ। গ্রেট আইরীর উচ্চতা ৫০০০ ফুটের বেশি নয়। অ্যালেঘানির পর্বতারোহীরা এরকম উচ্চতায় হরহামেশাই উঠছে। ইতোমধ্যেই আমরা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৩০০০ ফুট ওপরে উঠে এসেছি। সুতরাং চুড়োয় ওঠা খুব একটা কষ্টকর হবে না মনে হয়। খুব জোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব গন্তব্যে। তবে, কিছু বাধা বিপত্তি তো আছেই। আছে চড়াই উৎরাই, ফাটল পেরোতে গেলেও দেখা দিতে পারে নানা ঝামেলা। কোন্ বিপদ কোথায় ওত পেতে আছে তা আমাদের অজানা। গাইড দু'জনের অবস্থাও আমাদের মতই। আমরা সবাই শুধু জানি, গ্রেট আইরীর মাথায় ওঠা অসম্ভব। তবে মি. স্মিথের কথামত পাথর গড়িয়ে পড়ে যদি সত্যিই কোন পথ বের হয়ে থাকে, তাহলে সেটা রীতিমত সৌভাগ্য বলতে হবে।

সারাদিনে বার বিশেক পাইপ খান মি. স্মিথ। 'অবশেষে ভালভাবেই রওনা দিলাম আমরা,' দিনের প্রথম পাইপ ধরাতে ধরাতে বললেন তিনি, 'এখন কতক্ষণ লাগে এই হলো কথা।'

'যতক্ষণই লাগুক শেষ না দেখে ফিরছি না আমরা।'

'তা তো বটেই।'

'চীফ গ্রেট আইরীর রহস্য জানার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।'

'রহস্য উদঘাটন আমরা করবই। দরকার হলে সারা পাহাড় উথাল-পাতাল করব।'

'যদি সত্যিই তাই হয়, তাহলে অভিযান তো আজ শেষ হবে না। খাবারের পরিমাণটা বোধ হয় একবার দেখা দরকার।'

'ঘাবড়াবেন না। গাইড দু'জনের ন্যাপস্যাকে আছে দু'দিনের খাবার। তাছাড়া আমাদেরগুলো তো আছেই। আর নিয়াকোকে ছেড়ে এলেও বন্দুক তো ছেড়ে আসিনি। বনে জঙ্গলে, পাহাড়ের নিচের দিকের খাঁজে প্রচুর শিকার পাওয়া যাবে। পাহাড়ের ওপর হয়তো রান্না করার জন্যে আগুনও পাওয়া যাবে। চুড়োয় উঠে হয়তো দেখব, চুলো ধরানোই আছে।'

'চুলো ধরানোই আছে! বলেন কি!'

'কেন নয় শুনি? যে আগুনের শিখা দেখে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, তা কি এত তাড়াতাড়ি নিভে গেছে? অন্তত ছাইয়ের নিচে চাপা আগুন তো লুকানো আছে। আর গ্রেট আইরী যদি সত্যি আগ্নেয়গিরিই হয় তাহলে কি জ্বালামুখের কোথাও আমরা একটু আগুনও পাব না? ডিম বা আলু সেদ্ধ করার মত আগুনও যদি না পাই, তাহলে তো ওটা আগ্নেয়গিরি হতেই পারে না। আমার বিশ্বাস, আগুন আছে।'

এ পর্যন্ত কোন ধারণাই আমি পাইনি। চীফের অর্ডার, গ্রেট আইরীর রহস্য ভেদ করতে হবে। যদি দেখি এটা সাধারণ পাহাড়, তাহলে সবাইকে সে কথা বলে আশ্বস্ত করব। কিন্তু অন্য মানুষের মত স্বভাবসুলভ কৌতূহল আমার মধ্যেও আছে। গ্রেট আইরীতে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো যদি সত্যি সত্যিই রহস্যময় হয় তাহলে সেগুলোর জট ছাড়াতে আমি আনন্দই পাব।

এভাবেই শুরু হলো আমাদের পর্বতারোহণ। ভাল পথ খুঁজে বের করার জন্যে গাইড দু'জন চলল সামনে সামনে। তাদের পেছনে পেছনে আমি আর ইলিয়াস স্মিথ। অল্প খাড়া একটা গিরিসঙ্কট উঠে গেছে গাছ আর পাথরের ফাঁক দিয়ে। পায়ের নিচে ঝির ঝির করে বয়ে চলেছে ছোট একটা পানির ধারা। বর্ষাকালে এই ক্ষীণ স্রোতস্বিনীই নিশ্চয় পাহাড়ের ফাটল বেয়ে প্রচণ্ড বেগে নামে জলপ্রপাতের মত। ক্রমে ক্রমে আরও ক্ষীণ হয়ে এল স্রোতস্বিনী। বোঝা যাচ্ছে, বৃষ্টির পানি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এই স্রোতস্বিনীর। গ্রেট আইরীর ভেতরের কোন হ্রদের পানি এটা নয়।

ঘণ্টাখানেক পর পথ এমন খাড়া হয়ে গেল যে, ডানে বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে উঠতে হলো। এতে অগ্রগতিও ব্যাহত হলো অনেকখানি। ক্রমে গিরিসঙ্কটটা যাত্রার অযোগ্য রূপ নিল। পা রাখার জায়গাও নেই বললেই চলে। হামাগুড়ি দিয়ে, গাছের শেকড় ধরে অতিকষ্টে উঠতে লাগলাম। এভাবে উঠতে থাকলে মাথায় ওঠার আগেই ডুবে যাবে সূর্য।

'বুঝেছি!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন মি. স্মিথ, 'কেন মানুষ গ্রেট আইরীতে উঠতে চায় না। আমার জানামতে তো এ পাহাড়ে কেউ ওঠেনি।'

'আসল কথা হলো, এত কষ্ট করে উঠে যদি কোন লাভ না হয়, মানুষ উঠবেই

বা কেন? আমরা উঠছি বিশেষ কারণ আছে বলেই—'

'খাঁটি কথা,' বলল হ্যারি হর্ন। 'বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বহুবার উঠেছি ব্ল্যাকডোমে। কিন্তু এরকম ঝামেলায় পড়তে হয়নি।'

'মনে হচ্ছে, এ ঝামেলা আর শেষ হবে না,' বলল জেমস ব্রাক।

এর মধ্যে দেখা দিল আরেক সমস্যা। কোন দিকে যাব? ডাইনে না বাঁয়ে? দু'দিকেই ঘন বন। ওই বনে ঢোকার চেয়ে খাড়া পাথর বেয়ে ওঠাও সোজা। তবে এই বনটা পার হলে হয়তো ভাল কোন পথ পাওয়া যাবে। এখন গাইড দু'জনের সহজাত বিচার বুদ্ধির ওপর নিজেদের সঁপে দিয়ে এগোনোই ভাল। দু'জনের মধ্যে জেমস ব্রাক বেশি কাজের লোক। সাহসী এই ছোকরা বানরের মত হালকা, বুনো ছাগলের মত চটপটে। ওর পিছু নিতে গিয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে গেল আমাদের দু'জনের।

কিন্তু দুর্বল মানুষ নই আমি। নিয়মিত ব্যায়াম করি। প্রয়োজনের সময় পিছ-পা হই না। তাই জেমস ব্রাক যেখানেই যাক, সবরকম কষ্ট সহ্য করে আমিও চললাম তার পিছু পিছু। কিন্তু মরগ্যানটনের ফার্স্ট ম্যাজিস্ট্রেট তো আর আমাদের মত শক্তিশালী, কর্মঠ বা কমবয়েসী নন। দেহও বেশ মোটাসোটা। আমরা যাতে পিছিয়ে না পড়ি, সেজন্যে অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করলেন না ভদ্রলোক। কিন্তু যখন দেখলাম, সীলমাছের মত হাঁপাচ্ছেন তিনি, গাইডদের থামতে বললাম আমি।

হিসেবে ভুল হয়েছে আমাদের। গ্রেট আইরীতে উঠতে যত সময় লাগবে ভেবেছিলাম, আসলে লাগছে তারচেয়ে অনেক বেশি। ভেবেছিলাম, এগারোটার মধ্যেই পৌঁছে যাব পাথুরে দেয়ালের তলায়। কিন্তু এখন বারোটা বাজে। অথচ এখনও উঠতে হবে বেশ কয়েকশো ফুট।

ভাল পথের আশায় এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করার পর গাইডরা থামতে ইশারা করল আমাদের। ঘন বনের অপর প্রান্তে এসে গেছি আমরা। এখানে গাছপালা অনেকটা ফাঁকা ফাঁকা। তার ভেতর দিয়ে চোখে পড়ল গ্রেট আইরীর খাড়া দেয়াল।

'ওরে বাপরে!' বড়-সড় একটা পাইন গাছে হেলান দিয়ে বসলেন মি. স্মিথ। 'একটু বিশ্রাম নিই। সাথে কিছু খাবার হলেও মন্দ হয় না।'

'এক ঘণ্টার বিশ্রাম,' বললাম আমি। 'বেজায় খাটুনি গেছে ফুসফুস আর পায়ের ওপর। এবার পেটটাকে খাটানো দরকার।'

এ ব্যাপারে সবাই একমত হলো। খানিক বিশ্রাম নিলে নতুন উদ্যম ফিরে পাওয়া যাবে। আমাদের একমাত্র অশান্তির কারণ সামনের এই খাড়া পাথুরে পাঁচিল। স্থানীয় বাসিন্দারা এটাকে বলে—স্লাইড। এর ভেতর দিয়ে উপরে উঠবার কোন পথ নেই।

'উঁহু, গতিক সুবিধের নয়,' বন্ধুকে বলল হ্যারি হর্ন।

'ওঠা বোধহয় অসম্ভব,' জবাব দিল ব্রাক।

ভেতরটা শুকিয়ে গেল আমার ওদের কথাবার্তা শুনে। রহস্য ভেদ তো দূরের কথা, পাহাড়ে না উঠেই যদি ফিরে যেতে হয়, কৌতূহলের বারোটা বেজে যাবে আমার। তাছাড়া, মি. ওয়ার্ডকেই বা মুখ দেখাব কি করে?

ন্যাপস্যাক খুলে রুটি আর ঠাণ্ডা মাংস দিয়ে লাঞ্চ সারলাম আমরা। আধ ঘণ্টার মধ্যেই খাবার পাট চুকল। লাফ দিয়ে নতুন উদ্যমে সামনে এগোলেন মি. স্মিথ। দলপতির ভার নিল জেমস ব্রাক।

খুব ধীরে এগোতে লাগলাম আমরা। আমাদের গাইডের মুখে স্পষ্ট সন্দেহের ছাপ। হঠাৎ আমাদের ছেড়ে সামনে এগোল হর্ন, দেখতে গেল পথ আদৌ আছে কি নেই।

মিনিট বিশেক পর ফিরল সে। আমাদের নিয়ে চলল উত্তর-পশ্চিম দিকে। তিন চার মাইল সামনে ব্ল্যাকডোম। আমাদের পথের অবস্থা এখনও খুব খারাপ। আলগা পাথর আর তারের মত শক্ত ঝোপ ছড়িয়ে আছে। অনেক কষ্টে শ'দুয়েক ফুট উঠতেই সামনে পড়ল বিশাল এক ফাটল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছেঁড়া শেকড়, ভাঙা ডালপালা, বড় বড় পাথর পাউডারের মত গুঁড়ো হয়ে গেছে। পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেন নেমে গেছে বিশাল কোন হিমবাহ।

'গ্রেট আইরীর বড় পাথরটা এদিক দিয়েই গড়িয়ে নেমেছে,' বলল জেমস ব্রাক।

'তাতে কোন সন্দেহ নেই,' বললেন মি. স্মিথ। 'তা পথ যখন একটা তৈরি হয়েছে তখন এ পথ ধরেই এগোনো যাক।'

পর্বতারোহণের জন্যে এই জায়গাটাই মনে মনে বেছেছিল হ্যারি হর্ন। শক্ত মাটির ওপর পা রাখতে আর অসুবিধে হলো না। অনেক সহজ হয়ে এল আমাদের কাজ। সোজাসুজি ওপরে ওঠার ফলে সাড়ে বারোটা নাগাদ পৌঁছলাম 'স্লাইড'-এর প্রান্তে।

গ্রেট আইরীর সর্বশেষ বাধাটা আর মাত্র একশো ফুট সামনে। ঝাড়া একশো ফুট উঠে গেছে খাড়া দেয়াল।

চুড়োর দিকে দেয়ালটা অসমতল। এখানে সেখানে মাথা বের করে আছে ছুঁচের মত পাথর। এক জায়গায় পাথরের প্রান্তটা দেখে মনে হয়, আকাশের গায়ে যেন লেপটে আছে বিশাল এক ঈগল। উড়ে উঠবে এখনই। না। এদিক দিয়ে ওপরে ওঠার কোন সম্ভাবনা নেই।

'একটু দাঁড়ান,' বললেন মি. স্মিথ, 'সামান্য বিশ্রাম নিয়ে তারপর দেখা যাক অন্যদিক দিয়ে ওঠা যায় কিনা।'

'এদিক দিয়েই পাথর গড়িয়ে পড়েছে,' বলল হ্যারি হর্ন, 'সুতরাং এদিক দিয়ে ওঠা না গেলে আর কোন দিক দিয়েই ওঠা যাবে না।'

দু'জনের কথাই ঠিক। কোনদিক দিয়ে রাস্তা একটা বের করতেই হবে। মিনিট দশেক বিশ্রামের পর দেয়ালের একেবারে গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। তারপর পথের সন্ধানে ঘুরতে লাগলাম চারপাশে।

এত কাছ থেকে গ্রেট আইরীকে মনে হলো যেন একটা স্বপ্নপুরী। মনে হলো, এখানে যেন ড্রাগন আর দানবের বাস। পৌরাণিক কাহিনীর কাইমিরা, (মাথা সিংহের, ল্যাজ সাপের ও ছাগলের মত দেহের কল্পিত অগ্নি উদগীরণকারী দানব) গ্রিফিন ও অন্যান্য দানব এসে এখানে আস্তানা গাড়লেও আমি বোধহয় এতটুকু আশ্চর্য হতাম না।

দেড় ঘণ্টা ধরে অতি কষ্টকর চক্কর শেষ করে আবার ফিরে এলাম আগের

জায়গায়। হতাশায় ভেঙে পড়লাম আমি। মি. স্মিথও আমার চেয়ে কম হতাশ হননি। সেইসাথে যথেষ্ট বিরক্ত।

চিৎকার করে বললেন, 'দুত্তোর! এবার বুঝলাম গ্রেট আইরী কি। এটা আগ্নেয়গিরি না ছাই! ভেতরে জ্বালামুখ তো নেই, আছে ঘোড়ার ডিম!'

বললাম, 'আগ্নেয়গিরি কিনা জানি না। তবে সন্দেহজনক কোন শব্দ তো শুনতেই পাচ্ছি না। ধোঁয়া বা আগুনের শিখারও চিহ্ন নেই। অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ে ভীত হবার কোন কারণই তো দেখি না।'

চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ। মাথার ওপরে ঝকঝক করছে আকাশ।

এই পাথুরে দেয়ালের পরিধি বিশাল। মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, ১২০০ থেকে ১৫০০ ফুট হবে। দেয়ালটা কতখানি পুরু জানতে পারলে ভেতরের গহ্বর কতটা চওড়া সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেত। অনেক ওপরে উড়ছে কিছু শিকারী পাখি। তাছাড়া আশপাশের কোথাও প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই।

এখন বাজে ঠিক তিনটে। বিরক্তিতে চিৎকার করে উঠলেন মি. স্মিথ, 'সারাদিন এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভটা কি হবে শুনি! চুড়োয় ওঠার তো বুদ্ধি নেই। মি. স্ট্রক, রাত নামার আগেই যদি প্লেজ্যান্ট গার্ডেনে ফিরতে চান, তাহলে আর দেরি না করে রওনা দিতে হবে এখনই।'

আমি কোন জবাব দিলাম না। যেখানে বসে ছিলাম সেখান থেকে নড়লামও না এতটুকু। আবার হাঁক দিলেন তিনি, 'মি. স্ট্রক, আপনি কিন্তু আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। চলুন, রওনা দেয়া যাক!'

আমার মনের অবস্থা তখন করুণ। যদি এখনই নামা শুরু করি, তাহলে তো আমার মিশন ব্যর্থ হয়ে যাবে। মনটা নাছোড়বান্দা হয়ে উঠল। দ্বিগুণ বেড়ে গেল কৌতূহল। কিন্তু জেদ যতই চাপুক, কি-ই বা করার আছে আমার? দুর্গম এই পাহাড় ভেঙে বা উল্টে ফেলে তো আর ভেতরে ঢোকা যাবে না। শেষমেষ গ্রেট আইরীর দিকে তীব্র একটা চাহনি হেনে সাথীদের পেছন পেছন নামতে শুরু করলাম।

বিশেষ কিছু কষ্ট হলো না নামার সময়। যেসব পথ দিয়ে অতি কষ্টে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে উঠেছিলাম, সেদিক দিয়ে স্রেফ গড়িয়ে নেমে এলাম। পাঁচটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের তলদেশে। উইলডনের কৃষক খুব খুশি হলো আমাদের দেখে। খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল দেখতে দেখতে। যেটার এখন খুব প্রয়োজন।

'ঢুকতে পারলেন না ভেতরে?' জানতে চাইল সে।

'না,' জবাব দিলেন মি. স্মিথ। 'ভেতর বলে কিছু থাকলে তো ভেতরে ঢুকব। ওটার ভেতরের চিন্তাটা আছে শুধু এখানকার লোকজনের মনে। যত্তোসব!'

প্লেজ্যান্ট গার্ডেনের বাড়ির সামনে এসে যখন গাড়ি থামল, তখন রাত সাড়ে আটটা। রাতটা কাটালাম ওখানেই।

ঘুম উবে গেল আমার চোখ থেকে। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম, কি করব? থেমে না পড়ে আবার কি নতুন করে পর্বতারোহণের চেষ্টা করব? কিন্তু প্রথম অভিযানের চেয়ে আহামরি এমন কি-ই বা ভাল হবে সেটা? না। ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে মি. ওয়ার্ডের সাথে পরামর্শ করাটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সুতরাং পরদিন গাইড দু'জনকে মোটা বখসিস দিয়ে ফিরে এলাম মরগ্যানটনে। তারপর গি. স্মিথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই রাতেই চেপে বসলাম ওয়াশিংটনগামী ট্রেনে।

চার

গ্রেট আইরীর রহস্য কি আমরা উদঘাটন করতে পারব না কোনদিন? নাকি আমাদের কল্পনাশক্তির বাইরে কোন ঘটনায় হঠাৎ খুলে যাবে এই রহস্যের দুয়ার? এর একমাত্র উত্তর দিতে পারে ভবিষ্যৎ। এই রহস্যের সমাধান করা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ? সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ, এরই ওপর নির্ভর করছে ওয়েস্টার্ন ক্যারোলিনার এতগুলো মানুষের নিরাপত্তা।

ওয়াশিংটনে ফিরে আসার দিন পনেরোর মধ্যেই এ উত্তেজনা চাপা পড়ে গেল নতুন ধরনের আরেক উত্তেজনায়। তবে এটার গুরুত্ব কম নয়।

মে মাসের মাঝামাঝি পেনসিলভেনিয়ার সবগুলো কাগজে ফলাও করে ছাপা হলো বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ঘটনার কথা।

প্রধান শহর ফিলাডেলফিয়া থেকে রাস্তা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। এইসব রাস্তার ওপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে চলে যাচ্ছে কি যেন একটা। জিনিসটা এত জোরে ছুটে চলে যাচ্ছে যে, ওটা দেখতে কেমন বা কত বড় তা কেউ বলতে পারছে না। তবে ওটা যে একটা মোটরগাড়ি, সে ব্যাপারে একমত হলো সবাই। মোটরগাড়িটা কি ধরনের সেটা বুঝতে না পারলেও কল্পনা করতে কেউ ছাড়ল না। আর জনসাধারণ যখন কল্পনার ঘোড়া ছোটায় তখন আর তাদের ঠেকায় কে?

এটা যে সময়ের কাহিনী, সে সময় বাষ্প, গ্যাসোলিন (পেট্রোল), বা বিদ্যুৎচালিত কোন মোটরগাড়িই ঘণ্টায় ষাট মাইলের বেশি ছুটতে পারত না। আমেরিকা ও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিবেগও ছিল এরকমই। অথচ এই আশ্চর্য যান নাকি ছুটে যাচ্ছে তার দ্বিগুণ বেগে।

বলা বাহুল্য, এত জোরে ছোটা অন্য যানবাহন বা পথচারীর পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। প্রথমে গুম গুম শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, তারপরই বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছে এই যন্ত্রযান। পেছনে রেখে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙে পড়ছে গাছের ডাল, আতঙ্কিত হয়ে উঠছে আশপাশের মাঠে চরে বেড়ানো গবাদিপশুর পাল। বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কা সইতে না পেরে মারা পড়ছে বহু পাখি।

খবরের কাগজের রিপোর্টে অদ্ভুত এক কাহিনী সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এত জোরে ছুটে যায় এই যান, অথচ রাস্তায় চাকার দাগ পড়ে থাকে না। কিন্তু ভারি কোন যানবাহন গেলে তো রাস্তায় চাকার দাগ পড়ার কথা। বড়জোর দেখা যায় ধুলোর একটা রেখা। পেছনে যে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় তাতে ধুলোর রেখা তো থাকবেই।

'বস্তু চূড়ান্ত বেগে ছুটে গেলে সম্ভবত তার ওজন কমে যায়' মন্তব্য করল নিউ

ইয়র্ক হেরাল্ড।

প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল চারদিক থেকে। এই পাগলামির একটা বিহিত করা দরকার। রাস্তায় প্রত্যেকটা যানবাহন ও পথচারী ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন।

কিন্তু এটাকে থামানো যাবে কি করে? এটা কার গাড়ি, কোথা থেকে আসে, যায়ই বা কোথায়, কেউ জানে না। বুলেটের মত ছুটে আসে এই গাড়ি, মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে যায়। বাতাসে ছুটে যাওয়া কামানের গোলাকে তো আর আটকানো সম্ভব নয়।

কি জাতের এঞ্জিনে ছুটছে এ গাড়ি তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এটা চলে যাওয়ার পর বাতাসে ধোঁয়া, বাষ্প, পেট্রোল বা অন্য কোন ধরনের তেলের গন্ধ ভেসে বেড়ায় না। এ গাড়ি সম্ভবত বিদ্যুৎচালিত। এতে আছে নতুন মডেলের অ্যাকিউমুলেটর, যাতে ব্যবহৃত হচ্ছে অজ্ঞাত কোন তরল পদার্থ।

তীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল জনসাধারণ। আর জনসাধারণ উত্তেজিত হলে যে কোন গুজবে কান দেয়। রহস্যময় এই গাড়ি সম্বন্ধেও প্রতিটি রিপোর্ট, গুজব বিশ্বাস করল তারা। এটাকে বলা হলো একটা ভৌতিক গাড়ি। এর ভেতরে বসে থাকে ভূত, অপদেবতা, পৌরাণিক পশুশালা থেকে পালিয়ে আসা দানব। মোট কথা, এই গাড়ি চালায় স্বয়ং শয়তান। তার প্রচণ্ড শয়তানী ক্ষমতার কাছে মানুষের ক্ষমতা তুচ্ছ।

কথা হলো, আমেরিকায় এত জোরে গাড়ি চালাতে গেলে স্বয়ং শয়তানকেও স্পেশাল পারমিট, গাড়ির নম্বর এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে হবে। কিন্তু খোঁজ খবর করে দেখা গেল, দু'শো মাইল বেগে গাড়ি চালানোর অনুমতি কাউকেই দেয়া হয়নি। অতএব, জনগণের নিরাপত্তার খাতিরে যেভাবেই হোক এই শয়তান ড্রাইভারের মুখোস খুলে ফেলতেই হবে।

এদিকে শুধু পেনসিলভেনিয়াতেই এই কাণ্ড ঘটল না। পুলিসের রিপোর্ট আসতে লাগল বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে। এই ভূতুড়ে গাড়িকে দেখা গেছে ফ্রাঙ্কফোর্টের কাছে কেনটাকিতে, কলাম্বাসের কাছে ওহাইয়োতে, ন্যাসভিলের কাছে টেনেসিতে, জেফারসনের কাছে মিসৌরীতে আর সবশেষে শিকাগোর পাশের ইলিনয়তে।

টনক নড়ল সারাদেশের। জনসাধারণের নিরাপত্তার খাতিরে এর বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেয়া কর্তৃপক্ষের জন্যে খুব জরুরী হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এরকম গতিতে ছুটে যাওয়া কাউকে গ্রেফতার তো দূরের কথা, আটকানোও অসম্ভব। বরং রাস্তাতে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা যেতে পারে। তাহলে কখনও না কখনও এসবের সাথে প্রচণ্ড সংঘর্ষে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ভূতুড়ে গাড়ি।

'যত্তোসব আজেবাজে চিন্তা'! বলল অবিশ্বাসীরা! 'কিভাবে ব্যারিকেড বাঁচিয়ে চলতে হয়, তা ওই পাগলা ড্রাইভারের ভাল করেই জানা আছে।'

'প্রয়োজন হলে ওটা ব্যারিকেডের ওপর দিয়ে লাফিয়েই চলে যেতে পারবে,' সায় দিয়ে বলল অন্যান্যেরা।

'আর ড্রাইভার যদি স্বয়ং শয়তানই হয়, তাহলে অন্য ধরনের কাণ্ডও ঘটতে পারে। সে তো আবার ভূতপূর্ব ফেরেস্তা। ফেরেস্তাগিরি হারালেও পাখাজোড়া নিশ্চয় ঠিকই আছে। হয়তো সে রকম দেখলে সাঁ করে উড়েই যাবে,' এমনও বলল কেউ

কেউ।

শেষের এই মন্তব্যটি যারা করল তারা অবশ্য এক নম্বর আহাম্মক। আসল সমস্যার কোন ধার ধারে না এরা। গুজব নিয়েই মেতে থাকে। শয়তানের যদি ডানা থাকে তাহলে তো সে পাখির মত উড়ে চলে যেতে পারে। এত ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি দাবড়িয়ে বেড়ানোর দরকারটা কি?

এ হেন পরিস্থিতিতে সে মাসের শেষ সপ্তাহে ঘটল নতুন আরেক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এবার সত্যি সত্যি মনে হলো, এক মহা দানবের খপ্পরে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আরও কত কি ঘটার বাকি আছে, তা-ই বা কে জানে! এরপর হয়তো আমেরিকা ছেড়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে হানা দেবে পাগলা ড্রাইভার।

আমেরিকার সবক'টা কাগজে প্রকাশিত হলো এই চাঞ্চল্যকর খবর। খবরটা হলো:

একটা মোটর রেসের আয়োজন করেছিল উইসকনসিনের মোটর ক্লাব। ম্যাডিসন এই রাষ্ট্রের রাজধানী। রাস্তাটা দুশো মাইল লম্বা। মোটর রেসের পক্ষে উপযুক্ত। শুরু হয়েছে পশ্চিম সীমান্তের প্রেইরী দু'চিয়েন থেকে। শেষ হয়েছে ম্যাডিসনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে লেক মিশিগানের পাড়ের মিলঅউকি ছাড়িয়ে কিছু সামনে। বিশাল সাইপ্রেস গাছে ছাওয়া জাপানের নিক্কো আর নামোদ-এর মধ্যবর্তী রাস্তা ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও উইসকনসিনের এই রাস্তার চেয়ে ভাল রাস্তা নেই। তীরের মত একটানা মাইল পঞ্চাশেক চলে গেছে এই রাস্তা।

এই রেসে অংশগ্রহণ করেছিল অনেক নামকরা মোটর। মোটর সাইকেলকেও অনুমতি দেয়া হয়েছিল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে। বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন কোম্পানীর গাড়ি এসেছিল এই রেসে। কারণ, মোট পুরস্কারের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার ডলার। প্রতিযোগিতাটা যে সাংঘাতিক হবে, এতে কোন সন্দেহ ছিল না। ধারণা করা হয়েছিল, অনেক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হবে।

হিসেব মত সর্বোচ্চ গতিতে ছোটা গাড়ির গতিবেগ ধরা হয়েছিল ঘণ্টায় আশি মাইল। অর্থাৎ দুশো মাইল পাড়ি দিতে সময় লাগবে ঘণ্টা তিনেক।

৩০ মে সকালে প্রেইরী-দু'চিয়েন থেকে মিলঅউকি পর্যন্ত রাস্তায় অন্য যানবাহনের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করল উইসকনসিন কর্তৃপক্ষ। এরপরও যদি কেউ গাড়ি নিয়ে বের হয় এবং দুর্ঘটনা ঘটে, সেজন্যে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

বহু লোক এল রেস দেখতে। উইসকনসিন ছাড়াও প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইলিনয়, মিশিগান, আয়োয়া, এমনকি নিউ ইয়র্ক থেকেও এল হাজার হাজার লোক। অনেক ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান, অস্ট্রিয়ান স্পোর্টসম্যান এল নিজের দেশের প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করার জন্যে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জুয়াড়ীদের দেশ, এল জুয়াড়ীরা। মোটা টাকার অনেক বাজি ধরা শুরু হয়ে গেল।

সকাল আটটায় শুরু হবে রেস। এ ধরনের রেসে দুর্ঘটনা একরকম অনিবার্য। সেটা এড়াতে ঠিক করা হলো, প্রতি দু'মিনিট অন্তর ছুটে যাবে একটা করে গাড়ি।

প্রথম দশজন প্রতিযোগীকে আটটা থেকে আটটা বিশের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হলো। দুর্ঘটনা না ঘটলে এগারোটার মধ্যে এদের অনেকেই পৌঁছে যাবে গন্তব্যে। পরের গাড়িগুলোও এভাবেই যাত্রা শুরু করল একে একে।

দেড় ঘণ্টা কেটে গেল। আর মাত্র একজন প্রতিযোগী আছে প্রেইরী-দু'চিয়েনে। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর রেসের অগ্রগতি সম্বন্ধে খবর আসছে টেলিফোনে। ম্যাডিসন আর মিলঅউকির মাঝামাঝি সবচেয়ে এগিয়ে আছে ফোর সিলিন্ডার, টোয়েন্টি হর্স পাওয়ারের মাইকেলিন টায়ার লাগানো রেনোয়া ব্রাদার্সের গাড়ি। এর ঠিক পেছনেই আছে একটা হারভার্ড ওয়াটসন আর একটা ডায়ন-বুটন। ইতোমধ্যেই অনেক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। কিছু কিছু গাড়ি অসহায় ভাবে পড়ে আছে রাস্তায়। প্রতিযোগিতার শেষ পর্যন্ত গোটা বারোর বেশি গাড়ি থাকবে বলে মনে হয় না। অনেক ড্রাইভারই আহত হয়েছে। তবে কারও অবস্থাই মারাত্মক নয়। আর যদি কেউ মারাও যায়, এই আমেরিকায় সেটা এমন চমকপ্রদ কোন খবর নয়।

কয়েকজন প্রতিযোগী মিলঅউকির ফিনিশিং লাইনের কাছাকাছি আসতে রাস্তার ধারে অপেক্ষমাণ জনতা স্বভাবতই দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বেলা দশটার দিকে পরিষ্কার বোঝা গেল, বিশ হাজার ডলারের প্রথম পুরস্কারটা পাবে পাঁচটা গাড়ির যে কোন একটা। এদের মধ্যে দুটো আমেরিকান, দুটো ফ্রেঞ্চ আর একটা ইংল্যান্ডের।

এদিকে চরম অবস্থা। বাজি ধরা নিয়ে। স্বদেশ প্রীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাজি পড়তে লাগল আমেরিকান গাড়ির পক্ষে। একসাথে এত লোক বাজি ধরায় হিমশিম খেয়ে গেল জুয়াড়ীরা। চারদিক থেকে শুরু হলো চিৎকার আর চেঁচামেচি।

'হারভার্ড ওয়াটসন ওয়ান-টু-থ্রী!'

'ডায়ন-বুটন ওয়ান-টু!'

'রেনোয়া!'

একটা করে নতুন খবর আসছে টেলিফোনে আর একযোগে হৈ হৈ করে উঠছে সবাই।

প্রেইরী-দু'চিয়েনের টাউন ক্লকে তখন সাড়ে ন'টা বাজে। হঠাৎ শহরের মাইল দুয়েক বাইরে থেকে ভেসে এল প্রচণ্ড শব্দ। ধুলোর মেঘের ভেতর থেকে শোনা গেল একটা গুম গুম শব্দ। সেই সাথে তীক্ষ্ণ আওয়াজ, ন্যাভাল সাইরেনের মত।

আর্তচিৎকার উঠল জনতার মধ্যে। ছিটকে সরে গেল যে যেদিক পারে। হ্যারিকেনের মত ছুটে গেল ধুলোর মেঘ। কেউ বুঝতে পারল না, কি গেল ওটা! তবে ওটার গতিবেগ ঘণ্টায় দেড়শো মাইলের কম নয়, এটা বুঝল সবাই।

দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল ভূতুড়ে গাড়ি। পেছনে পড়ে রইল শুধু সাদা ধুলোর একটা দীর্ঘ রেখা। এই গতিতে ছুটতে থাকলে মুহূর্তের মধ্যে সব প্রতিযোগীকে ছাড়িয়ে যাবে ওটা। তাদের দ্বিগুণ বেগে পৌঁছে যাবে গন্তব্যে।

আতঙ্ক কেটে যেতেই সামলে উঠে, চিৎকার জুড়ে দিল জনসাধারণ।

'এটাই সেই শয়তানের গাড়ি!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। পুলিশের সাধ্যও নেই এটাকে ধরে!'

'গত পনেরো দিন এটা ছিল কোথায়!'

'ভেবেছিলাম নষ্ট হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে। আর ফিরে আসবে না কখনও!'

'এটা শয়তানের গাড়ি, চলছে নরকের আগুনে। ড্রাইভার স্বয়ং শয়তান!'

সত্যি কথা বলতে কি, যদি শয়তানই না হবে তাহলে রহস্যময় এ গাড়ি এত জোরে কে চালিয়ে নিয়ে গেল? তবে এটা যে সেই আগের গাড়িটাই তা স্পষ্ট বোঝা গেল। এতদিন কোন খবর না পেয়ে পুলিশ যদি ভেবে থাকে, তাদের ভয়ে পালিয়ে গেছে গাড়িটা, তবে সে ধারণা ভুল।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতেই হুড়মুড় করে মানুষ ছুটল টেলিফোনের দিকে। সামনে যারা আছে তাদেরই শুধু নয়, সেই সাথে সাবধান করে দিল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সামনের গাড়িগুলোকেও।

সাবধান না হলে পাহাড়ী ধসের মত ছুটে যাওয়া এই পাগলা গাড়ির সামনে পড়ে ছাতু হয়ে যাবে সবকিছু।

আচ্ছা, দুর্ঘটনা যদি ঘটেই তাহলে এই উন্মাদ ড্রাইভারও কি আহত হবে না? মনে হয় না। সে নিশ্চয় খুব পাকা লোক। সবরকমের পরিস্থিতি সামাল দেয়ার কায়দা তার ভালই জানা আছে। সৌভাগ্যের বিষয়, উইসকনসিন কর্তৃপক্ষের ঘোষণার ফলে প্রতিযোগী গাড়িগুলো ছাড়া অন্য কোন যানবাহন নেই রাস্তায়। কিন্তু এভাবে নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে রাস্তায় নেমে পড়ার কি অধিকার আছে এই রহস্যময় গাড়ির?

ওদিকে টেলিফোন মারফত খবর পেয়ে প্রতিযোগীরা গ্র্যান্ড প্রাইজের কথা ভুলে সরে গেল রাস্তার একপাশে।। তাদের মতে, গাড়িটা তাদের পাশ দিয়ে ছুটে গেছে অন্তত দেড়শো মাইল বেগে। প্রতিযোগীরা প্রাণপণে ছুটছিল। তা সত্ত্বেও এই গাড়ি তাদের পাশ দিয়ে এত দ্রুত বেরিয়ে যায় যে, ওটার চেহারা কেমন, সেটুকু দেখার সৌভাগ্যও কারও হয়নি। চোখের পলকে যেন ছুটে গেল তিরিশ ফুট লম্বা একটা শলাকা। বন বন করে ঘুরে চলেছে চাকা। চোখে পড়ে কি পড়ে না।

এবারও দেখা গেল না ড্রাইভারকে। গাড়ির মধ্যে বসে থাকার কারণে প্রতিবারের মত এবারও সে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে গেল।

সাবধান করে দেয়া হলো মিলওউকিকে। খবর পেয়ে অবস্থা কি দাঁড়াল, তা সহজেই অনুমেয়। রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। ব্যারিকেডে ধাক্কা লেগে যেন ছাতু হয়ে যায় শয়তানের গাড়ি। কিন্তু সময় পাওয়া যাবে ভোর? যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে ওটা। হঠাৎ একটা জিনিস খেয়াল করল সবাই। রাস্তাটা শেষ হয়েছে লেক মিশিগানের পাড়ে। অতএব ব্যারিকেড দেয়ার দরকারই নেই। এই ড্রাইভার স্থলপথে যেমন দক্ষ, তেমনটা যদি জলপথে না হয়, তাহলে তাকে থামতেই হবে।

এদিকে দেশের অন্যান্য জায়গার মত রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার মধ্যেও শুরু হলো কল্পনার উদ্ভট ঘোড়া ছোটানো। গাড়ির চালক স্বয়ং শয়তান, একথা যারা বিশ্বাস করল না তারা বলল, বাইবেলে বর্ণিত অ্যাপোক্যালিপস থেকে নিশ্চয় নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর কোন দানব।

আর সময় নেই। যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে ভূতুড়ে গাড়ি।

তখনও এগারোটা বাজেনি। হঠাৎ রাস্তার প্রান্ত থেকে ভেসে এল গুম গুম গুম গুম শব্দ। সাংঘাতিক ঘূর্ণিঝড়ের মত পাক খেতে খেতে ধুলোর মেঘ লাফিয়ে উঠল শূন্যে। বাতাস চিরে ভেসে এল তীক্ষ্ণ হুইসলের শব্দ। সাবধান! এসে পড়েছে দানব

গাড়ি! যে যেখানে আছ, সরে যাও!

গাড়িটা রাস্তার প্রায় শেষে এসে পড়েছে। কিন্তু গতি কমেনি একটুও। আর মাত্র আধ মাইল সামনেই লেক মিশিগান। এভাবে ছুটলে এখনই ওটা সোজা গিয়ে পড়বে পানিতে। আচ্ছা, গাড়িটা খারাপ হয়ে যায়নি তো? এমনও তো হতে পারে, ড্রাইভার কিছুতেই আর ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ নেই। খসে পড়া তারার মত মিলঅউকির বুক চিরে বেরিয়ে গেল ওটা। এবার? শহর ছাড়িয়েই কি সোজা ওটা গিয়ে ঝাঁপ দেবে লেক মিশিগানে?

শেষ মুহূর্তে সামান্য মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা। পেছনে আর কোন চিহ্নই পড়ে রইল না।

পাঁচ

সব কাগজে যখন এইসব গরম গরম খবর প্রকাশিত হচ্ছে তখন আমি আবার ফিরে এসেছি ওয়াশিংটনে। ফেরার পথে টীফের অফিসে গিয়েছিলাম দেখা করতে। তাঁকে পেলাম না। পারিবারিক কারণে কয়েক সপ্তাহের জন্যে বাড়ি গেছেন। তবে, আমার ব্যর্থতার খবর নিশ্চয় পেয়েছেন তিনি। বিশেষ করে নর্থ ক্যারোলিনার খবরের কাগজগুলো যখন আমাদের গ্রেট আইরী অভিযানের আদ্যোপান্ত বর্ণনা দিয়েছে।

তাঁর অনুপস্থিতিতে মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল আমার। বুঝতে পারলাম না, এবার কি করা উচিত। গ্রেট আইরীর রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা বাদ দেব? না। এ হতে পারে না। বার বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও হাল ছেড়ে দেব না।

গ্রেট আইরীর দেয়ালের অপর পারে পৌঁছানো মানুষের সাধ্যের বাইরে, এ আমি বিশ্বাস করি না। মানুষ অত সহজে হারে না। চারদিকে ভারা বাঁধলেই চুড়োয় ওঠা যাবে। অথবা পাথর ফাটিয়ে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করলেও মনে হয় কাজ হবে। আমাদের এঞ্জিনিয়াররা এর চেয়ে অনেক কঠিন কঠিন কাজ করছে প্রতিদিন। তবে খরচের কথাটাও ভাবা দরকার। লাভের চেয়ে খরচই যদি বেশি হয়ে যায়, তাহলে তো সেটা করার কোন মানে নেই। সুড়ঙ্গ খুঁড়তে গেলে হাজার হাজার ডলার দরকার। শুধু জনসাধারণ আর আমার কৌতূহল মেটানোর জন্যে এত খরচা করার কোন যুক্তি আছে কি?

আমার নিজের এমন কিছু টাকা নেই। মি. ওয়ার্ড অবশ্য ইচ্ছে করলে সরকারী টাকা খরচ করতে পারেন। কিন্তু তিনি তো নেই। এ ব্যাপারে কোটিপতিদের উৎসাহিত করা যায় কিনা, তাও ভাবলাম। ওহ! তাঁদের যদি বলতে পারতাম, পাহাড়ের মধ্যে সোনা বা রূপার খনি আছে! কিন্তু এ ধরনের বাজে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। প্রশান্ত মহাসাগরীয় পর্বতমালা, ট্রানসভাল বা অস্ট্রেলিয়ার সোনার খনির কথা অনেকেই বিশ্বাস করবে। কিন্তু আপ্পালাচিয়ান পর্বতমালায়? উঁহু!

মি. ওয়ার্ড ফিরলেন ১৫ জুন। আমার ব্যর্থতার কথা জানা সত্ত্বেও ধমকালেন না। ঘরে ঢুকতেই সোল্লাসে বললেন, 'এই তো এসে গেছে আমাদের স্ট্রক সাহেব। আহা! বেচারা বড় করুণভাবে হার স্বীকার করেছে!'

'উপায় ছিল না, মি. ওয়ার্ড,' জবাব দিলাম আমি। 'প্রকৃতির বাধার কাছে মানুষ অসহায়। তবু হয়তো এই পাহাড় জয় করা যেত। কিন্তু উপযুক্ত শক্তি ছিল না আমার হাতে।'

'জানি। আমি সবই জানি। সে ব্যাপারে আমার একটুও সন্দেহ নেই, স্ট্রক। তবুও, গ্রেট আইরীতে কি ঘটছে তার কিছুই জানতে পারোনি তুমি, এ কথা তো ঠিক।'

'হ্যাঁ। কিছুই জানতে পারিনি।'

'আগুনের কোন আভাস চোখে পড়েনি?'

'না।'

'সন্দেহজনক শব্দ-টব্দ?'

'না।'

'তাহলে তো এখনও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না, গ্রেট আইরীর মধ্যে আগ্নেয়গিরি আছে কি নেই।'

'হ্যাঁ। এখনও অনিশ্চিত। তবে আগ্নেয়গিরি যদি থাকেও, সেটা যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, এ কথা বিশ্বাস করবার মত যথেষ্ট কারণ আমাদের হাতে আছে।'

'কিন্তু ওটা যে ফের জেগে উঠবে না, তারই বা বিশ্বাস কি? একটা আগ্নেয়গিরি সম্পূর্ণ নিভে না গেলে তার বিশ্বাস নেই। তবে গোটা ব্যাপারটাই যদি ক্যারোলিনার মানুষের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল হয়, সেটা আলাদা কথা।'

'না, স্যার। তা হতে পারে না। মরগ্যানটনের মেয়র মি. স্মিথ ও তাঁর বন্ধু, প্লেজ্যান্ট গার্ডেনের মেয়র, দু'জনেই দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাঁরা নিজ চোখে দেখেছেন গ্রেট আইরীর চুড়ো থেকে আগুনের শিখা বেরোতে। ভেতর থেকে শব্দ বেরিয়েছে, এ কথাও ঠিক। এই অদ্ভুত ঘটনা যে ঘটেছে, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।'

'বেশ,' বললেন মি. ওয়ার্ড। 'মানলাম ঘটনাগুলোকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু গ্রেট আইরীর রহস্য তো আর উদ্ধার করা গেল না।'

'রহস্য যদি জানতেই হয়, যথেষ্ট খরচ করলে ঠিকই জানা যাবে। গাঁইতি আর ডিনামাইট নিয়ে নেমে পড়লে ওই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে দেরি হবে না।'

'তা ঠিক। তবে এখন আর অত ঝামেলা করে লাভ কি? গ্রেট আইরী তো এখন চুপচাপ। আবার উৎপাত শুরু না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। এমনও হতে পারে, প্রকৃতিই হয়তো খুলে দেবে এই রহস্যের দুয়ার।'

'মি. ওয়ার্ড, বিশ্বাস করুন, যে কাজের জন্যে আপনি আমার ওপর নির্ভর করেছিলেন, সেটা না করতে পেরে আমি খুব লজ্জিত।'

'চুপ করো তো! মন খারাপ কোরো না, স্ট্রক। এই পরাজয় মেনে নাও। জীবনে মানুষ কি সবকিছুতেই সফল হয়? পুলিসকেও তো হারতে হয়। কত অপরাধীকে আমরা ধরতে পারি না! একটু বেশি বুদ্ধিমান হলে ওদের কাউকেই কি আমরা কখনও ধরতে পারতাম? আমার তো মনে হয়, অপরাধের প্ল্যান করা—সে

চুরি বা হত্যা যাই হোক না কেন, পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ। বিন্দুমাত্র সূত্র পেছনে ফেলে না রেখে অনায়াসেই এসব কাজ করা যায়। যাক, অপরাধতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমাকে জ্ঞানদান করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। নিশ্চয় বুঝতে পারছ, কি বলতে চাই। আমি কিছুতেই চাই না, অপরাধীরা বুদ্ধিমান হোক। ওরা যেমন আছে তেমনি থাকুক। এরপরও তো কত অপরাধী আমাদের আঙুলের ফাঁক গলে পালিয়ে যাচ্ছে।'

এ ব্যাপারে চীফের সাথে আমি একমত। অপরাধীদের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে পৃথিবীর সবচেয়ে গবেট লোকদের। এজন্যেই আরও অবাক হয়েছি রহস্যময় গাড়িটার বিন্দুবিসর্গ কেউ জানতে পারল না বলে। চীফ এই প্রসঙ্গ তুলতেই আমি আর আমার বিস্ময় গোপন রাখতে পারলাম না।

তিনি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। গাড়িটাকে অনুসরণ করা একরকম অসম্ভব। যতবার এটাকে দেখা গেছে, ততবারই, এমনকি টেলিফোনে খবর দেয়ারও আগে এটা উধাও হয়ে গেছে। বহু দক্ষ পুলিস এজেন্ট ছড়িয়ে আছে সারাদেশে। কিন্তু তাদের কেউই এই শয়তানকে ধরতে পারেনি। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় একটানা গাড়ি চালিয়েও যায়নি সে। মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়েই আবার যেন মিলিয়ে গেছে বাতাসে। একবারই শুধু তাকে দেখা গেছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। প্রেইরী থেকে মিলঅউকি পর্যন্ত পথ সে পেরিয়েছে দেড় ঘণ্টারও কম সময়ে।

ওই ঘটনার পর আজব গাড়িটার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। রাস্তার শেষ পর্যন্ত ছুটে এসে গতিবেগ সামাল দিতে না পেরে ওটা কি ডুবে গেছে লেক মিশিগানের পানিতে? গাড়ি আর তার ড্রাইভার কি শেষ হয়ে গেছে? তাহলে কি ভয় পাবার মত আর কিছু নেই? অধিকাংশ লোক কিন্তু বিশ্বাস করল না এ কথা। তারা বলল, আবার দেখা যাবে ওটাকে।

ঘটনাটা যে অসাধারণ, তা খোলাখুলিই স্বীকার করলেন মি. ওয়ার্ড। আমিও তাঁর সাথে একমত হলাম। এই শয়তান ড্রাইভারকে যদি সত্যিই আর দেখা না যায়, তাহলে গোটা ঘটনাটাকে 'মানুষের বুদ্ধির অগোচর রহস্য'—আখ্যা দিয়ে ধামাচাপা দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

গোটা ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হলো চীফের সাথে। ভাবলাম, এবার আমার ওঠার পালা। এইসময় বার কয়েক পায়চারি সেরে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'হুঁ, মিলঅউকিতে যা ঘটে গেল তা খুবই আশ্চর্যজনক। তবে এখানে যা আছে সেটাও কম আশ্চর্য নয়।'

বোস্টন থেকে আসা একটা রিপোর্ট আমার হাতে তুলে দিলেন তিনি। বিষয়টা নিয়ে ইভনিং পেপারগুলো সবে হৈ চৈ শুরু করেছে। রিপোর্টে চোখ দিতেই বাইরে থেকে ডাক এল চীফের। জানালার পাশে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলাম রিপোর্টটা।

কিছুদিন ধরে মেইন, কানেকটিকাট ও ম্যাসাচুসেটসের উপকূলে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে। কেউ সঠিক বর্ণনা দিতে পারছে না। তীর থেকে দু'তিন মাইল দূরে পানির ভেতর দিয়ে কি যেন একটা চলে যায় প্রবল আলোড়ন তুলে। ঢেউ চিরে একটা ছুটে যায় সামনে, আবার পিছিয়ে আসে, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়।

এত জোরে ছোটে যে, সেরা টেলিস্কোপেও ধরা পড়ে না। জিনিসটা তিরিশ ফুটের বেশি লম্বা হবে না। চেহারা চুরুটের মত আর রঙ সবুজাভ হওয়ার জন্যে সাগরের পানির সাথে প্রায় মিশে থাকে। কেপ কড আর নোভা স্কটিয়ার উপকূল বরাবরই এটাকে বেশি দেখা গেছে। প্রভিডেন্স, বোস্টন, পোর্টসমাউথ আর পোর্টল্যান্ড থেকে অনেক মোটরবোট ও স্টিম লঞ্চ চেষ্টা করেছে জিনিসটার কাছে ঘেঁষবার। তাড়া করার চেষ্টাও করেছে। পারেনি। আশপাশে যাবার আগেই তীরের মত ছুটে চলে গেছে ওটা দৃষ্টিসীমার বাইরে।

স্বভাবতই এই ঘটনা নিয়ে শুরু হলো জল্পনা-কল্পনা। গুজব। কিন্তু কোন ধারণাই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো না। নাবিকেরা প্রথমে এটাকে মনে করল তিমির মত প্রকাণ্ড কোন মাছ। কিন্তু এটা তো জানা কথা, তিমি মাছ কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর ভেসে ওঠে শ্বাস নেয়ার জন্যে। তাছাড়া তিমি নাকের ফুটো দিয়ে পানি আর বাতাস মিশ্রিত পিচকারি ছাড়ে। কিন্তু এটা তো সেরকম কোন পিচকারি ছোঁড়েনি। শ্বাসও নেয়নি শব্দ করে। তো, এটা যদি কোন সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী জীব না হয়, তাহলে এটা কোন জাতের অজানা দানব? পৌরাণিক সেই দানবগুলো নয়তো? ক্র্যাকেন, লেভিয়াথান বা শুঁড়ওয়ালা সামুদ্রিক সাপ?

নিউ ইংল্যান্ডের কূল বরাবর সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে এই ঘটনায়। জেলে নৌকো বা প্রমোদতরীগুলো কূল ছেড়ে বেশি দূর যাওয়ার সাহস পাচ্ছে না। এটাকে দেখা গেলেই নৌকোগুলো তড়িঘড়ি ছুটছে সবচেয়ে কাছের বন্দর লক্ষ্য করে। দানবটা হিংস্রও হতে পারে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওটার কবলে পড়া তো আর বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

বড় জাহাজ ও স্টীমারের অবশ্য তিমি বা অন্যান্য দানবকে দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। এ ধরনের জাহাজে করে দু'এক মাইল দূর থেকে জিনিসটাকে দেখেছে অনেকেই। কিন্তু কাছে যাবার চেষ্টা করতেই বিদ্যুৎগতিতে পালিয়েছে ওটা। একদিন বোস্টন থেকে আমেরিকান একটা গানবোট এটাকে তাড়া করেছিল। উদ্দেশ্য, ধরতে না পারলেও এটাকে লক্ষ্য করে কয়েক বার কামান দাগা। কিন্তু চোখের পলকে মিলিয়ে গেছে ওটা। চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেছে। ওটা নৌকো বা মানুষকে আক্রমণ করতে চায় না।

এই পর্যন্ত পড়া হতেই ফিরে এলেন মি. ওয়ার্ড।

বললাম, 'সামুদ্রিক সাপ বা আর যাই হোক, এটাকে কোন দোষ দেয়া যায় না। বড় জাহাজ দেখলে পালিয়ে যায়। ছোট নৌকো দেখে তাড়া করে না। মাছ হলে তো এই অনুভূতি বা বুদ্ধি থাকার কথা নয়।'

'কিন্তু তাদের আবেগ থাকে। আর সেই আবেগ যদি প্রবলভাবে চাড়া দেয়--'

'কিন্তু এটা তো কারও ক্ষতি করেনি। দু'একটা ব্যাপার ঘটতে পারে। হয় এটা উপকূল ছেড়ে চলে যাবে অথবা ধরা পড়বে। ধরা পড়লে অবসর সময়ে এটাকে ভাল করে পরীক্ষা করা যাবে ওয়াশিংটন যাদুঘরে।'

'কিন্তু এটা যদি সামুদ্রিক জন্তু না হয়?'

'তাহলে আর কি হতে পারে?' বিস্মিত হয়ে প্রতিবাদ করলাম আমি।

'পড়াটা আগে শেষ করো,' বললেন চীফ।

তাই করলাম। রিপোর্টের শেষের দিকে কিছু কিছু অংশে তিনি লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছেন।

প্রথমে সবাই ভেবেছে, এটা সামুদ্রিক জন্তু। তাড়া দিয়ে উপকূল থেকে ভাগানো যাবে। কিন্তু অন্য ধরনের একটা মত শোনা গেল। জনসাধারণ সন্দেহ করতে শুরু করল, মাছের আকারে এটা কোন নতুন, শক্তিশালী জাহাজ নয় তো?

যদি তাই হয়, তাহলে প্রচণ্ড শক্তি এর এঞ্জিনে। যে বৈজ্ঞানিক এটা তৈরি করেছেন, তিনি হয়তো তাঁর গূঢ় আবিষ্কার রহস্য ফাঁস করার আগে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। তাক লাগিয়ে দিতে চান নৌ জগৎকে। এটার অনায়াস চলাফেরা, পানি তোলপাড় করে ছোটা, তীরের মত গতি সবই সারা পৃথিবীর কৌতূহল উদ্রেক করার পক্ষে যথেষ্ট।

সে সময় জলযান তৈরির ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বিশাল সব স্টীমার আটলান্টিক পাড়ি দিত মাত্র পাঁচ দিনে। এঞ্জিনিয়াররা আরও উন্নতির আশা করছেন। নৌবাহিনীও পিছিয়ে নেই। তাদের ক্রুজার, টর্পেডো বোট, ডেস্ট্রয়ার, ভারতীয় সওদাগরী জাহাজ বা আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে দ্রুতগতি স্টীমারের সাথে পাল্লা দিতে সক্ষম।

নতুন ধরনের জাহাজ হলেও, এটার গড়ন সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা এখনও পাওয়া যায়নি। তবে আজ পর্যন্ত তৈরি সবচেয়ে শক্তিশালী এঞ্জিনের চেয়েও এটার এঞ্জিনের শক্তি নিশ্চয় অনেক অনেক বেশি। কিসে চলে এই এঞ্জিন, তা-ও অজানা। তবে, যেহেতু এটার কোন প্রাল্ল নেই, তাই মনে হয়, এটা বাতাসে চলে না। কোন চিমনি নেই। সুতরাং এটা বাষ্পচালিতও নয়।

এই পর্যন্ত পড়ে আবার থামলাম। জিনিসটা ঠিক বোঝা গেল না। চুপচাপ ভাবছি, কি বলা যায়।

'কি ভাবছ, স্ট্রক?' শুধোলেন চীফ।

'ভাবছি, এই জাহাজটা তো প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে পারে। ঠিক এইরকম গতিতেই ছুটতে পারত সেই অদ্ভুত মোটরটা। আর এই দুটোর কোনটার এঞ্জিন সম্বন্ধেই আমরা কিছু জানি না।'

'হুঁ! এই তাহলে তোমার ধারণা?'

'হ্যাঁ।'

এখানে একটা মাত্র সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। ধরা যাক, লেক মিশিগানে চিরকালের মত সলিল সমাধি হয়েছে রহস্যময় ড্রাইভারের। কিন্তু এখন এই নাবিকের রহস্য উদ্‌ঘাটন করাটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং এ কাজ যদি করতেই হয়, তাহলে সেটা করতে হবে জাহাজটা মহাসাগরের অতলে ডুব দেয়ার আগেই। কিন্তু এতবড় একটা আবিষ্কারকে লুকিয়ে রেখেই বা আবিষ্কর্তার কি লাভ? শুধু আমেরিকা নয়, পৃথিবীর যে কোন দেশ তো এটাকে যে কোন মূল্যে কিনতে রাজি হবে।

সেই ভূতুড়ে গাড়ির চালক আত্মপরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। তেমনি এই জাহাজের আবিষ্কারকও হয়তো পরিচয় গোপন রাখতে চান। প্রথম গাড়িটা যদি এখনও থেকেও থাকে, ওটার কথা আর শোনা যায়নি। তেমনি এই দ্বিতীয়টাও যদি

নানা কেরামতি দেখানোর পর অমনি করে অদৃশ্য হয়ে যায়, সে হবে এক চরম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

গতকাল এই রিপোর্টটা এসেছে ওয়াশিংটনে। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। কিন্তু উপকূলের আর কোথাও এই রহস্যময় জাহাজটাকে দেখা যায়নি। ফলে যে সম্ভাবনার কথা ভেবে ভয় হচ্ছিল, সেটা আরও জোরেসোরে চেপে বসল বুকের ওপর। ওটাকে বোধহয় আর দেখা যাবে না। আর সত্যিই যদি দেখা না যায়, সে হবে আরেক বিপজ্জনক ব্যাপার।

অদ্ভুত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আমি খেয়াল করেছিলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার, মি. ওয়ার্ডও খেয়াল করেছেন সেটা। তা হলো অদ্ভুত মোটরটা অদৃশ্য হয়ে যাবার আগ পর্যন্ত দেখা যায়নি অদ্ভুত জাহাজটাকে। তাছাড়া, দুটোরই এঞ্জিন ভয়ঙ্কর শক্তিশালী। দুটোই যদি একসাথে যাত্রা শুরু করে তাহলে সারা পৃথিবীর নিরাপত্তা নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। জলে, স্থলে, উভয় স্থানেই। নৌকায়, যানবাহনে বা পায়ে হেঁটে যাওয়া কোন মানুষই নিরাপদ থাকবে না। সুতরাং এখন পুলিসের অত্যন্ত তৎপর হওয়া প্রয়োজন। তাদের উচিত যাত্রাপথে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

এভাবেই সমস্যাটা আমার সামনে তুলে ধরলেন মি. ওয়ার্ড। আমাদের কাজ কি, সেটা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কাজটা করব কিভাবে, তা বোঝা যাচ্ছে না। এই নিয়ে আরেক দফা আলোচনা করলাম আমরা। কিন্তু লাভ হলো না কিছুই। আমি যখন কেবল উঠতে যাচ্ছি, শেষ একটা ধারণা দিলেন চীফ।

'একটা জিনিস বোধহয় তুমি খেয়াল করোনি, স্ট্রক,' বললেন তিনি, 'মোটর আর জাহাজ, দুটোরই চেহারার মধ্যে বিস্ময়কর এক সাদৃশ্য আছে।'

'হ্যাঁ। আপনি ঠিকই বলেছেন। কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য আছে।'

'আচ্ছা, তাহলে তো এমনও হতে পারে যে, দুটো আসলে একই জিনিস?'

ছয়

মি. ওয়ার্ডের ওখান থেকে বেরিয়ে আমার লংস্ট্রীটের বাড়িতে এলাম। মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড়। বৌ, বাচ্চার কোন বালাই নেই আমার। কাজের মানুষ বলতে পুরানো এক চাকরানী। মায়ের আমল থেকেই আছে। গত পনেরো বছর ধরে সে-ই আমার সবকিছু দেখাশোনা করে।

মাস দুয়েক আগে ছুটি নিয়েছিলাম। তার মধ্যেই ডাক পড়েছিল গ্রেট আইরীতে যাবার জন্যে। আরও দু'সপ্তাহ বাকি আছে সে ছুটির।

অথচ এখন সে ছুটি বাতিল করে মিলঅউকি আর নিউ ইংল্যান্ডের উপকূলে যে রহস্যময় ঘটনা ঘটে গেল, তার পেছনে ছোটা আমার কর্তব্য। এই জোড়া রহস্য সমাধানের জন্যে অনেক চিন্তা ভাবনাই করলাম। কিন্তু কোন্ সূত্র ধরে সেই মোটর বা জাহাজকে খুঁজে পাওয়া যাবে, তার তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

নাস্তা সেরে পাইপ ধরিয়ে গা এলিয়ে দিলাম ইজিচেয়ারে। হাতে খবরের কাগজ। কোন খবরটা পড়ব? রাজনীতিতে খুব একটা আগ্রহ নেই আমার। তাছাড়া রিপাবলিক্যান আর ডেমোক্র্যাটদের চিরকালীন বিবাদের কচকচানি আর কাঁহাতক পড়া যায়? সামাজিক টানাপোড়েন বা খেলার পাতাও ভাল লাগে না। ভাবলাম, দেখি তো নর্থ ক্যারোলিনা থেকে গ্রেট আইরী সংক্রান্ত কোন খবর এসেছে কিনা। এরকম সংবাদ থাকার সম্ভাবনা অবশ্য খুব কম। কারণ, মি. স্মিথ বলেছেন, তেমন কিছু হলে তৎক্ষণাৎ আমাকে টেলিগ্রাম করে খবর দেবেন। মরগ্যানটনের মেয়রও যে তথ্য পাবার জন্যে আমার মত কৌতূহলী হয়ে আছেন, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। না, নতুন খবর কিছুই নেই। হাত থেকে কখন কাগজটা পড়ে গেল জানি না। আবার আমি ডুবে গেলাম গভীর চিন্তায়।

মি. ওয়ার্ডের শেষ কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে—দুটো মেশিনই আসলে এক নয় তো? অন্তত মেশিন দুটো তৈরি করেছে হয়তো একই লোক। দুটোর এঞ্জিন যে এক তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ স্থল বা জলপথের সর্বোচ্চ গতিশীল যানের চেয়ে এই দুই মেশিনই দ্বিগুণ বেগে ছোটে।

'দুটোরই আবিষ্কারক তাহলে একজনই!' আবার ভাবলাম মনে মনে।

এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হবার গুরুতর কারণ আছে। দুটো মেশিনকে এক সাথে কোথাও দেখা যায়নি।

বিড়বিড় করে নিজের মনে বললাম, 'গ্রেট আইরীর পরই এল এই মিলঅউকি আর বোস্টনের রহস্য। এ রহস্য উদ্ধার করতে গেলে কি গ্রেট আইরী অভিযানের মতই দশা হবে?'

নতুন এই সমস্যাটার মিল আছে আগের রহস্যটার সাথে। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে জনসাধারণের। গ্রেট আইরীর ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ে শুধুমাত্র ব্লুরিজ অঞ্চলের মানুষই তটস্থ হয়েছিল। কিন্তু এবার তো আমেরিকার প্রত্যেকটা রাস্তা, উপকূল ও সমুদ্র বন্দর হুমকির সম্মুখীন।

এদিকে যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। খবরের কাগজগুলো তিলকে তাল করে জনসাধারণের আতঙ্কের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। ভয়ে কাঠ হয়ে আছে ভীতু নাগরিকরা। আমার বুড়ি চাকরানীটা খুবই সহজ সরল। কুসংস্কার আছে মেলা। সুতরাং তার অবস্থাও কাহিল। ডিনারের পর টেবিল ধোয়া-মোছা করতে এসে আমার সামনে দাঁড়াল সে। এক হাতে পানির বোতল, আরেক হাতে তোয়ালে। উৎকণ্ঠার সাথে জানতে চাইল, 'কোন খবর পেলেন, স্যার?'

'না,' জবাব দিলাম আমি। বেশ বুঝতে পারলাম, সে কিসের কথা জানতে চাইছে।

'মোটরগাড়িটাকে আর দেখা যায়নি?'

'না।'

'জাহাজটা?'

'না। সবচেয়ে ভাল কাগজেও কোন খবর নেই।'

'কিন্তু, আপনাদের গুপ্তচরেরা কি বলে?'

'আমরাও বিশেষ কিছু জানি না।'

'তাহলে স্যার, দেশে পুলিস রেখে লাভ কি বলুন?'

এই একই প্রশ্ন এর আগেও অনেকবার শুনেছি।

'এবার দেখেন, কি হয়,' বক বক শুরু হলো বুড়ির, 'কোনরকম সংবাদ না দিয়ে হঠাৎ একদিন এসে পড়বে ওই পাগলা ড্রাইভার। আমাদের রাস্তা দিয়ে ছুটে যাবার সময় চিঁড়ে চ্যাপটা করে দিয়ে যাবে সবাইকে।'

'বেশ! যদি তাই হয়, তাহলে তো তাকে ধরার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।'

'তাকে কখনও ধরা যাবে না, স্যার।'

'কেন?'

'কারণ সে স্বয়ং শয়তান। শয়তানকে কিছুতেই গ্রেফতার করা যায় না। আপনিও পারবেন না।'

ভাবলাম, শয়তানকে তাহলে অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। যে রহস্যের জট ছাড়ানো যায় না, সেখানে শয়তানকে হাজির করলেই জনসাধারণকে বোঝানো যায়, এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

গ্রেট আইরীর মাথায় আগুন জ্বালানো, উইসকনসিন রেসে রেকর্ড করা, কানেকাটিকাট আর ম্যাসাচুসেটসের উপকূলে ছোটাছুটি, এগুলো সবই কি শয়তানের কাজ? কিন্তু শয়তানকে বাদ দিলেও ভীষণ একটা সমস্যার মুখোমুখি যে হয়েছি আমরা, তাতে সন্দেহ নেই। দুটো মেশিনই কি চিরকালের মত উধাও হয়ে গেল?

এটা ছুটে গিয়েছিল উল্কার মত। মহাকাশে খসে পড়া তারার মত। একশো বছর পর এই দুঃসাহসিক ঘটনা হয়তো পরিণত হবে কিংবদন্তীতে। আগামী শতাব্দী জুড়ে হয়তো এটা হবে গল্পের খোরাক।

বেশ কয়েকদিন ধরে আমেরিকা-ইউরোপের কাগজগুলো গরম গরম খবর ছাপল। সম্পাদকীয়র ওপর সম্পাদকীয়। গুজবের ওপর গুজব। গপ্পোবাজদের তো পোয়াবারো। দুই মহাদেশের সমস্ত লোক যেন একেবারে মেতে উঠল। ইউরোপের কোথাও কোথাও এমন কি ঈর্ষান্বিত হলো মানুষ। এমন একখানা খাসা কাণ্ড ঘটছে কিনা আমেরিকায়! এই বৈজ্ঞানিক যদি আমেরিকান হয়, তাহলে ব্যাটাদের স্থলবাহিনী, নৌবাহিনীর তো মহা উন্নতি হবে। অন্য সব দেশের সামরিক শক্তিকে ছাড়িয়ে যাবে ওরা।

১০ জুন নিউ ইয়র্কের এক খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। দ্রুততম যানের সাথে মন্থরতম যানের তুলনামূলক বিচার করে বলা হয়েছে, আমেরিকা যদি এই আবিষ্কারের গোপন তথ্য জেনে ফেলে তাহলে ইউরোপ আসতে তাদের সময় লাগবে তিনদিন। কিন্তু ইউরোপ থেকে আমেরিকায় কেউ পাঁচ দিনের আগে যেতে পারবে না।

গ্রেট আইরী রহস্যের ব্যাপারে মাথা ঘামিয়েছিল আমেরিকান পুলিস। কিন্তু নতুন এই সমস্যার পেছনে আদাজল খেয়ে লাগল পৃথিবীর সব দেশের ডিটেকটিভরা।

মি. ওয়ার্ডের সাথে দেখা হলেই এই প্রসঙ্গ ওঠে। উনি আলোচনা শুরু করেন গ্রেট আইরীতে আমার ব্যর্থতা নিয়ে। আমি তখন বলি, টাকা ঢাললেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

জবাবে তিনি বলেন, 'কিছু মনে কোরো না, স্টুক। সুযোগ এখনও হাতছাড়া

হয়ে যায়নি তোমার। পৃথিবীর সমস্ত ডিটেকটিভের আগেই যদি মোটর আর জাহাজের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারো, তাহলে ভেবে দেখো, কতখানি গৌরব বাড়বে আমেরিকান পুলিসের! তোমাকে নিয়ে তো ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।'

'হ্যাঁ। তা ব্যাপারটা যদি আমার হাতে ছেড়ে দেন—'

'থামো, থামো। একটু ধৈর্য ধরো।'

এরকম পরিস্থিতিতে ১৫ জুন আমার বুড়ি চাকরানীটা একটা রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়ে গেল। ঠিকানা দেখলাম। অপরিচিত হাতের লেখা। পোস্ট অফিসের ছাপ দেখে বুঝলাম, দু'দিন আগে চিঠিটা পোস্ট করা হয়েছে মরগ্যানটন থেকে।

মরগ্যানটন! মি. ইলিয়াস স্মিথ চিঠি লিখলেন তাহলে।

হাতের কাছে আর কাউকে না পেয়ে খুশিতে চিৎকার করে বুড়িকে বললাম, 'মি. স্মিথের চিঠি। মরগ্যানটনের আর কাউকে তো আমি চিনি না। তার চিঠি লেখার মানে, খবর আছে।'

'মরগ্যানটন?' বলল বুড়ি, 'ওখানকার পাহাড়েই তো আগুন জ্বালিয়েছিল শয়তানেরা। তাই না?'

'ঠিক ধরেছ।'

'স্যার, আপনি আবার মরগ্যানটনে যাবেন নাকি?'

'কেন, যাব না কেন?'

'করুণ, গেলে গ্রেট আইরীর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন। আমি চাই না, আপনি ওভাবে অপঘাতে মারা যান, স্যার।'

'অত ভয় পেয়ো না। আগে দেখি সংবাদটা ভাল না খারাপ।'

লাল গালা দিয়ে খামের মুখ বন্ধ করা। সীলমোহরটা আজব ধরনের। একটা কোট-অভ-আর্মস, তার ওপরে তিনটে তারা। পুরু, মজবুত কাগজের খামটা ছিঁড়ে চিঠি বের করলাম। একটা মাত্র পাতা, চার ভাঁজ করা। কাগজের এক পৃষ্ঠে শুধু লেখা হয়েছে চিঠিটা। প্রথমেই চোখ পড়ল নামের দিকে।

নাম নেই। চিঠির শেষে শুধু তিনটি অক্ষর।

'আরে, এ চিঠি তো মরগ্যানটনের মেয়রের নয়,' বললাম আমি।

'তাহলে কার?' জানতে চাইল বুড়ি। চোখে মুখে কৌতূহল।

অক্ষর তিনটে আবার ভাল করে দেখে বললাম, 'জানি না। মরগ্যানটনের নাকি অন্য জায়গার কেউ এ চিঠি লিখেছে, বুঝতে পারছি না।'

হাতের লেখাটা স্পষ্ট। সবসুদ্ধ বিশ লাইনের চিঠি। যাই হোক, চিঠিটা হুবহু তুলে দিচ্ছি। কারণ, চিঠিটা লেখা হয়েছে কোথা থেকে এটা চোখে পড়তেই একেবারে বোকা বনে গিয়েছিলাম। চিঠিটা লেখা হয়েছে গ্রেট আইরী থেকে।

গ্রেট আইরী, ব্লুরিজ মাউন্টেনস্,
নর্থ ক্যারোলিনা, ১৩ জুন।

পাবেন,
মি. স্টক।
চীফ ইন্সপেক্টর অব পুলিস।
৩৪, লং স্ট্রীট, ওয়াশিংটন, ডি. সি.

জনাব,

গ্রেট আইরীর ভেতরের রহস্য উদ্‌ঘাটন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আপনার ওপর।

গত ২৮ এপ্রিল মরগ্যানটনের মেয়র আর দু'জন গাইডসহ আপনি এসেছিলেন গ্রেট আইরীতে।

পাথুরে দেয়ালের পাদদেশে পৌঁছেছিলেন আপনি। দেয়ালের চারপাশে চক্করও দিয়েছিলেন। কিন্তু উঠতে পারেননি। দেয়ালটা বড় বেশি খাড়া আর উঁচু।

আপনি পাথরের একটা ফাটল খুঁজছিলেন। পাননি।

একটা কথা পরিষ্কার জেনে রাখুন: আজ পর্যন্ত গ্রেট আইরীতে কেউ ঢোকেনি। যদি বা কেউ ঢোকে তাহলে সে আর বেরোতে পারে না।

যা করেছেন, করেছেন। আর চেষ্টা করতে যাবেন না। প্রথমবার ভালয় ভালয় ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি চেষ্টা করেন, ফলাফলটা প্রথমবারের মত হবে না। ডেকে আনবে সমূহ বিপদ।

সাবধান করে দিলাম। এটাকে হেসে উড়িয়ে দেবেন না। যদি দেন, জানবেন, কপালে খারাপি আছে আপনার।

সাত

স্বীকার করতে বাধা নেই, চিঠিটা পড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল বিস্ময়ধ্বনি। আমার দিকে চেয়ে ছিল বুড়ি। বুঝতে পারছিল না, কি করবে।

বলল, 'খবর খারাপ নাকি, স্যার?'

বুড়ি খুব বিশ্বাসী। ওর কাছে আমি প্রায় কিছুই গোপন করি না। তাই গোটা চিঠিটা পড়ে শোনালাম। উদ্বিগ্ন মুখে শুনল বুড়ি।

'ফাজলামো করেছে কেউ,' বললাম আমি।

বুড়ির খুব কুসংস্কার আছে। বলল, 'এই চিঠি স্বয়ং শয়তান না লিখলেও শয়তানের দেশ থেকে এসেছে, এটা ঠিক।'

চলে গেল সে। চিঠিটা আরেকবার পড়লাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, কেউ ইয়ার্কি করেছে। গ্রেট আইরী মিশন যে ব্যর্থ হয়েছে, সে কাহিনী সব কাগজেই প্রকাশিত হয়েছে। আমেরিকায় ব্যঙ্গ করার মত লোকের অভাব নেই। তাদেরই কেউ এই ভয়ঙ্কর চিঠি পাঠিয়েছে আমাকে বিদ্রূপ করার জন্যে।

আরেকটা কথা আমার মনে হলো। গ্রেট আইরীকে যে চোর ডাকাতের আস্তানা মনে করা হয়েছিল, সে ধারণা একেবারে বাজে। তারা তো পুলিসের নাগালের বাইরেই থাকতে চায়। নিজেদের আস্তানার ঠিকানা ফাঁস করে পুলিসকে হুমকি দেয় না। চ্যালেঞ্জ করলে পুলিস যে দ্বিগুণ তৎপর হয়, এটা তারা ভাল করেই জানে। ডিনামাইট বা মেলিনাইট ব্যবহার করলেই খান খান হয়ে যাবে তাদের দুর্গ।

তাছাড়া, তারা গ্রেট আইরীর ভেতরে ঢুকলই বা কি করে? তাহলে, আমরা খুঁজে না পেলেও ওটার ভেতরে ঢোকার জন্যে নিশ্চয়ই কোন সুড়ঙ্গ আছে। সন্দেহ নেই, এ চিঠি কোন পাগল বা জোকারের লেখা। এটাকে গুরুত্ব দেয়া পাগলামি। উদ্বিগ্ন হবারও দরকার নেই।

চকিতে একবার ভেবেছিলাম, চিঠিটা মি. ওয়ার্ডকে দেখাব। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে সে চিন্তা বাদ দিলাম। মনে হয় না, এ চিঠি পড়ে তিনি কোন গুরুত্ব দিতেন। তবে চিঠিটা আমি নষ্টও করলাম না। তালা বন্ধ করে রাখলাম ডেস্কে। ভবিষ্যতে একই লোকের লেখা আরও চিঠি যদি পাই, তবু পরোয়া করব না।

দিন কয়েক বেশ শান্তিতে কাটল। ওয়াশিংটন ছেড়ে যাবার মত কোন ঘটনা ঘটল না। তবে আমার এমন এক ধরনের কাজ, যেখানে আগামীকাল কি ঘটবে তা-ও নিশ্চিত করে বলা কঠিন। এখনই অরিগন থেকে ফ্লোরিডা বা মেইন থেকে টেক্সাসের মধ্যে যে কোন জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে। এদিকে অস্বস্তিকর চিন্তাটা সবসময় আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—গ্রেট আইরীতে ব্যর্থ হয়েছি। নতুন এই কাজটাতেও ব্যর্থ হলে চাকরি ছেড়ে দেব।

রহস্যময় ড্রাইভারের আর কোন খবর নেই। আমেরিকান স্পাই ছাড়াও বিদেশী স্পাইরা উপকূল, লেক, নদী ও রাস্তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। তবে এ কথাও ঠিক, সারা আমেরিকা তন্ন তন্ন করে খোঁজা খুব কঠিন। দুটো মেশিনের কোনটাকেই নিরিবিলি জায়গায় দেখা যায়নি। রেসের দিন উইসকনসিনের হাইওয়েতে আর হাজার হাজার জলযান ভর্তি বোস্টন বন্দরে দেখা গেছে ওটাকে। কিন্তু এগুলো লুকানোর জায়গা নয়। দুঃসাহসী ড্রাইভার যদি বেঁচেও থাকে, সে নিশ্চয় আমেরিকা ছেড়ে চলে গেছে। হয়তো অন্যান্য দেশের পানি তোলপাড় করে ফিরছে। অথবা বিশ্রাম নিচ্ছে এমন এক জায়গায়, যে জায়গা সে ছাড়া আর কেউ চেনে না। আর সত্যি যদি তাই হয়—

হঠাৎ টনক নড়ল আমার। লুকাতেই যদি হয় তাহলে গ্রেট আইরীর চেয়ে ভাল লুকানোর জায়গা আর কোথায় আছে! কিন্তু একটা জাহাজ বা মোটর গাড়ি তো সেখানে যেতে পারে না। ঈগল বা কণ্ডর এ ধরনের বিশাল শিকারী পাখিরাই শুধু সেখানে যেতে পারে।

১৯ জুন পুলিস ব্যুরোর উদ্দেশে বাড়ি থেকে বেরিয়েই মনে হলো, দু'জন লোক যেন আমাকে লক্ষ করছে। কিন্তু আমি তখন অন্য চিন্তায় বিভোর। তাই ব্যাপারটাকে তেমন পাত্তা দিলাম না। কিন্তু ফেরার পর বুড়ির কথা শুনে আমাকে নড়েচড়ে বসতে হলো।

সে নাকি খেয়াল করেছে, বেশ কিছুদিন ধরে দু'জন লোক আমার ওপর নজর রেখেছে। বাড়ির একশো ধাপ দূরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে দু'জনে। আমি বেরোলেই পিছু নেয়।

'ঠিক মত দেখেছ?' জানতে চাইলাম আমি।

'জ্বী, স্যার। গতকালই তো লোক দুটো এল আপনার পেছন পেছন। দরজা বন্ধ করে দিতে চলে গেল ওরা।'

'ভুল দেখোনি তো?'

'না, স্যার।'

'এই লোক দুটোকে দেখলে তুমি চিনতে পারবে?'

'পারব।'

'বেশ,' হো হো করে হেসে উঠে বললাম, 'তোমার মধ্যে ডিটেকটিভ হবার গুণাবলী আছে দেখছি। তোমাকে তো আমাদের দলে টেনে নেয়া দরকার।'

'ঠাট্টা করছেন, স্যার? করেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আমার চোখে ছানি পড়েনি। লোক চিনতে চশমার দরকার হয় না আমার। আপনার পেছনে যে লোক লেগেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আপনার উচিত ওদের পেছনে আপনাদের লোক লাগিয়ে দেয়া।'

'তা করা যাবে,' ওকে খুশি করার জন্যে বললাম আমি। 'আমার লোক ওদের পাকড়াও করলেই জানা যাবে, ব্যাটারা আমার কাছে কি চায়।'

সত্যি কথা বলতে কি, বুড়ির কথার খুব একটা গুরুত্ব দিলাম না। তবু বললাম, 'এবার থেকে বাইরে গেলে চোখ কান খোলা রেখে চলব।'

'তাই করবেন, স্যার।'

অযথা ভয় পায় এই বুড়ি। তাই আবার বলল, 'এবার ওদের দেখলে বাইরে যাবার আগেই সাবধান করে দেব আপনাকে।'

'তাই কোরো,' বলে ইতি টানলাম আলোচনার। বুড়িকে বকর বকর চালাতে দিলে শেষমেষ হয়তো বলে ফেলবে, স্বয়ং শয়তান তার প্রধান চ্যালা নিয়ে লেগে পড়েছে আমার পেছনে।

পরের দু'দিন ভাল করে খেয়াল করলাম। কোন স্পাইয়ের চিহ্নমাত্র চোখে পড়ল না। ভাবলাম, বুড়ির পুরানো স্বভাব রয়েই গেছে। অযথা ভয় পাওয়া। কিন্তু ২২ জুন সকালে হাঁপাতে হাঁপাতে বুড়ি উঠে এল ওপরতলায়। চাপা গলায় বলল, 'স্যার! স্যার!'

'কি ব্যাপার?'

'ব্যাটারা এসেছে!'

'কারা'

'স্পাই দু'জন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। জানালার একেবারে সামনেই। বাড়ির ওপর নজর রেখেছে। আপনি বাইরে গেলেই পিছু নেবে।'

জানালার কাছে গিয়ে খুব আস্তে করে ঝিলিমিলিটা তুলে ধরলাম। তাই তো! দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথে।

দু'জনই বেশ দেখতে। শক্তিশালী চওড়া কাঁধ, বয়েস চল্লিশের নিচে। মাথায় স্নাউচ হ্যাট, পরনে মোটা উলের সুট, পায়ে মজবুত জুতো, হাতে ছড়ি। দু'জনেই আমার বাড়ির দিকে চেয়ে আছে। আমাকে অবশ্য খেয়াল করল না ওরা। নিজেদের মধ্যে সামান্য কি বলাবলি করে দু'জনই এগিয়ে গেল কিছুটা। একটু পরেই আবার ফিরে এল।

'এরাই সেই লোক?'

'জ্বী।'

আমারও তাই মনে হচ্ছে। বুড়ির কথাকে আর উড়িয়ে দিতে পারলাম না। এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ওদের পিছু নেয়ার চিন্তা করে তখনই সেটা বাতিল করে দিলাম। ওরা নিশ্চয় আমাকে ভালভাবে চেনে। সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করেও লাভ হবে না। কিন্তু আজই একজন ভাল স্পাই লাগাব ওদের পেছনে। ওরা কে, সেটা জানা দরকার।

ব্যাটারা নিশ্চয় অপেক্ষা করছে, আমি কখন পুলিস হেডকোয়ার্টারে যাব। যদি আমার পিছু পিছু যায়, তাহলে ধরে বেশ একটু ধোলাই দিতে হবে।

বুড়ি এখনও উঁকি মেরে দেখছে। হ্যাটটা নিয়ে নিচে নেমে দরজা খুলে পা দিলাম রাস্তায়।

গায়েব হয়ে গেছে দু'জনই।

সারাদিন অনেক চেষ্টা করেও আর ওদের দেখতে পেলাম না। পরেও বাড়ির সামনে বা আর কোথাও ব্যাটাদের চোখে পড়ল না। কিন্তু দু'জনেরই চেহারা মনে গেঁথে গেছে। যেখানেই দেখি, ঠিক চিনতে পারব।

পরে ভাবলাম, অন্য কারও ওপর নজর রাখতে গিয়ে হয়তো আমার পিছু নিয়েছিল ওরা। কয়েকদিন পর ভুল বুঝতে পেরেছে। শেষমেষ ভাবলাম এম. ও. ডব্লু নামে লেখা উড়ো চিঠিটার মতই এ বিষয়েও গুরুত্ব দেয়ার দরকার নেই।

২৪ জুন জানা গেল আরেক ঘটনা। আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলাম আমি। কৌতূহলী হয়ে উঠল জনসাধারণ। খবরটা প্রথম প্রকাশিত হলো ওয়াশিংটন ইভনিং স্টারে। পরদিন সবক'টা কাগজে।

'টোপেকার চল্লিশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কানশাসের লেক কারডাল। জায়গাটা এমন কিছু বিখ্যাত নয়। কিন্তু এই লেকই ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'চারপাশে পাহাড় ঘেরা এই লেক। পানি বেরিয়ে যাবার কোন পথ নেই। বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়া পানির ঘাটতি পূরণ করে আশপাশের ছোট নদী ও ভারি বৃষ্টি।

'লেকটির আয়তন পঁচাত্তর বর্গমাইল। পাহাড়ের উচ্চতার তুলনায় পানির রেখা বেশ নিচু। এখানে আসতে হলে সরু গিরিসঙ্কটের ভেতর দিয়ে আসা ছাড়া উপায় নেই। পাড়ে অনেকগুলো গ্রাম আছে। এখানে প্রচুর মাছ, তাই প্রচুর জেলে নৌকোও আছে।

'কোন কোন জায়গায় তীরের কাছেই পানির গভীরতা পঞ্চাশ ফুট। তীর বরাবর মাথা উঁচিয়ে আছে চোখা পাহাড়। বাতাসের বেগ বাড়লে বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ে তীরে। কখনও কখনও সামুদ্রিক ঝড়ের মত ফুঁসে উঠে আঘাত হানে গ্রামে। যে হ্রদের তীরেই পানি এত গভীর তার মাঝখানটা কতখানি গভীর হবে তা সহজেই আন্দাজ করা যায়। শোনা যায়, পানি নাকি কোথাও তিনশো ফুটের চেয়েও বেশি গভীর।

'এখানে মাছের ব্যবসা চালাচ্ছে কয়েক হাজার জেলে। হ্রদ পারাপারের জন্যে কয়েকশো জেলে নৌকা ছাড়াও ডজন খানেক ছোট স্টীমার আছে। পাহাড়ের বাইরে চারপাশ ঘিরেই আছে রেলপথ। এই পথেই মাছ চালান দেয়া হয় কানশাস

ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে।

'আমরা যে ঘটনা বর্ণনা করতে যাচ্ছি সেটা পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে লেক কারডালের এই বিবরণ দরকার।'

বিবরণের পরেই শুরু হয়েছে ইভনিং স্টারের চমকপ্রদ কাহিনী।

'বেশ কিছুদিন ধরে এখানকার জেলেরা একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করছে। আশ্চর্যজনকভাবে ফুলে উঠেছে হ্রদের পানি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, হ্রদের তলদেশ থেকে কিসের ঠেলায় যেন ফেঁপে উঠছে পানি। একেবারে শান্ত পরিবেশ, যখন একটু বাতাসও বয় না, তখনও ফেনায়িত হয়ে ফুঁসে উঠছে পানি।

'স্রোত আর ঢেউয়ের এই অতর্কিত মিলিত আক্রমণে প্রায়ই ছিটকে চলে যাচ্ছে নৌকোগুলো। সম্ভব হচ্ছে না নিয়ন্ত্রণ করা। কখনও একটার সাথে আরেকটা নৌকো ধাক্কা লেগে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।

'নিশ্চয় কিছু একটা ঘটছে হ্রদের তলদেশে। অনেকরকম কথা শোনা যাচ্ছে এ বিষয়ে। প্রথমে মনে করা হয়েছিল ভূমিকম্প, পরে অগ্ন্যুৎপাত। কিন্তু পরে সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, ঘটনাটা বিশেষ একটা জায়গায় ঘটছে না। কখনও ছুটে যাচ্ছে তীর বরাবর, কখনও হ্রদের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, আবার কখনও ঠিক মাঝখানে। সুতরাং ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ধারণা একেবারেই ধোপে টেকে না।

'আরেকটা কথা শোনা গিয়েছিল। কারও মতে, এটা কোন জলজ দানব। কিন্তু দানবটা যদি হ্রদেই জন্মগ্রহণ করে বড় না হয় তাহলে এটাকে অবশ্যই বাইরে থেকে আসতে হবে। কিন্তু বাইরের কোন জলপথের সাথে লেক কারডালের সম্পর্ক নেই। হ্রদটা যদি কোন মহাসাগরের কাছে হত তাহলে না হয় ভূগর্ভের সুড়ঙ্গ পথে পানি আসতে পারত। কিন্তু আমেরিকার ঠিক মাঝখানে, সমুদ্র পৃষ্ঠের বেশ কয়েক হাজার ফুট ওপরে এটা অসম্ভব। মোট কথা, এই ঘটনা জন্ম দিয়েছে আরেক ধাঁধার। আর এ ধাঁধার সমাধান করার চেয়ে ভুল ব্যাখ্যার অসম্ভাব্যতা যাচাই করা অনেক সোজা।

'হ্রদের তল দিয়ে কি চলাফেরা করছে কোন ডুবোজাহাজ? এ ধরনের জাহাজ তো আর অসম্ভব বস্তু নয় এখন। কয়েক বছর আগে কানেকটিকাটের ব্রীজপোর্টে একটা জাহাজ দেখা গেছে। নাম—দি প্রটেকটর। এটা পানির ওপর দিয়ে, নিচ দিয়ে, এমন কি ডাঙাতেও চলতে পারত। জাহাজটা আবিষ্কার করেছিলেন লেক নামের এক বৈজ্ঞানিক। দুটো মোটর ছিল যন্ত্রটায়। পঁচাত্তর হর্স পাওয়ারের বৈদ্যুতিক মোটর একটা। আরেকটা আড়াইশো হর্স পাওয়ারের পেট্রোল মোটর। সাথে একগজ ব্যাসের চাকা। ফলে যন্ত্রটা রাস্তাতে যেমন গড়িয়ে যেতে পারত, তেমনি সাঁতরাতে পারত পানিতে।

'কিন্তু এটাকে সাবমেরিন বলে স্বীকার করে নিলেও একটা প্রশ্ন থেকে যায় এটা লেক কারডালে এল কি করে? চারপাশ তো পাহাড়ে ঘেরা। সামুদ্রিক দানবই যদি আসতে না পারে, সাবমেরিন আসবে কি ভাবে?

'এই ধাঁধার জবাব কেউ দিতে পারল না। তবে ২০ জুনের একটা ঘটনা এ সমস্যার সমাধানে নতুন আলোকপাত করল। সবগুলো পাল তুলে ছুটছিল স্কুনার

মারকেল, হঠাৎ পানির নিচে কিছু একটার সাথে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো। এখানে কোন ডুবো পাহাড় বা চড়া থাকার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, পানি এখানে আশি নব্বই ফুট গভীর। স্কুনারটার সামনের অংশ ও একটা পাশ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। ডেক পানিতে তলিয়ে যাবার আগে কোনমতে এসে ভিড়ল তীরে।

'পাম্প করে মারকেল থেকে সমস্ত পানি বের করে দিয়ে ডাঙায় তুলে পরীক্ষা করে দেখা গেল, ওটার সামনের অংশে র‍্যামরডের মত শক্ত কিছু আঘাত হেনেছে।

'আর কোন সন্দেহ নেই। একটা সাবমেরিনই ছুটে বেড়াচ্ছে হ্রদের তলে।

'সমস্যাটা আসলেই শক্ত। আর সমস্যা একটাও নয়। সাবমেরিনটা হ্রদে এল কি করে, সে সমস্যা তো আছেই, উপরন্তু, এলই বা কেন? পানির ওপর একবারও ভেসে উঠছে না কেন? ওটার মালিকের আত্মগোপন করে থাকারই বা কি অর্থ? ওটার দ্বারা কি আরও কিছু নৌকো বা জাহাজ দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে?'

ইভনিং স্টারের আর্টিকেল শেষ করা হয়েছে দারুণ একটা মন্তব্য টেনে।

'রহস্যময় মোটরগাড়ির পর এল রহস্যময় জাহাজ। এবারে আবির্ভূত হয়েছে রহস্যময় সাবমেরিন।

'তাহলে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না যে, বিস্ময়কর তিনটে আবিষ্কারের আবিষ্কর্তা একজনই? এবং তিনটে মেশিনই আসলে একটা মেশিন?'

আট

ইভনিং স্টারের শেষ মন্তব্য যেন খুলে দিল রহস্যের দুয়ার। সবাই গ্রহণ করল এ ব্যাখ্যা। মেশিন তিনটের আবিষ্কর্তা যে একজন শুধু তাই নয়, তিনটে আসলে একই মেশিন!

ব্যাখ্যা দিলেও একটা জিনিস বোঝা গেল না। এমন কাণ্ড কিভাবে সম্ভব? এক যন্ত্র কি আরেক যন্ত্রে রূপান্তরিত হতে পারে? একটা মোটর কি করে জাহাজ বা সাবমেরিন হয়? মেশিনটা সবই পারে, পারে না শুধু আকাশে উড়তে। এটা পারলে ষোলোকলা পূর্ণ হত। তবু, মেশিন তিনটের আয়তন, চেহারা, জ্বালানি গন্ধহীন অবস্থা, সর্বোপরি অসাধারণ গতিবেগ—সব মিলে মেশিন যে একটা তারই ইঙ্গিত দেয়। জনসাধারণ একটুতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এখন এই নতুন ঘটনা আরও জাগিয়ে দিল তাদের কৌতূহল।

খবরের কাগজগুলো এবার আবিষ্কারের গুরুত্ব নিয়ে পড়ল। মেশিন একটাই হোক বা তিনটে, এটা যে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রমাণেরও তো আর বাকি নেই কিছুই। সুতরাং যত টাকাই লাগুক, মেশিনটা কিনতে হবে। জাতির কল্যাণার্থে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অবশ্যই এটা কেনা উচিত। ইউরোপের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোও নিশ্চয় হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। এই মেশিন স্থল ও নৌবাহিনীর জন্যে অমূল্য সম্পদ। যে রাষ্ট্র এটাকে হস্তগত করবে, জলে-স্থলে তার শক্তি যে কতখানি বাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যন্ত্রটার বিধ্বংসী ক্ষমতার

পরিমাণ অবশ্য জানা যায়নি। যাই হোক, এ গূঢ় তথ্যের জন্যে খরচ কোন ব্যাপারই নয়। যত মিলিয়ন ডলারই লাগুক, আমেরিকার উচিত হবে না কোনমতেই এটাকে হাতছাড়া করা।

কিন্তু কথা হলো, মেশিন কিনতে গেলে তো এটার আবিষ্কর্তাকে খুঁজে বের করতে হবে। আর এইখানেই যত গোল।

লেক কারডাল তছনছ করে ফেলা হলো। লাভ হলো না কিছুই। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো হ্রদের তলদেশ পর্যন্ত। কিছু নেই। তাহলে কি সাবমেরিন ভেগেছে? কিন্তু সাবমেরিনটা গেল কিভাবে? এসেছিলই বা কিভাবে? না, এ সমস্যার কোন সমাধান নেই!

সাবমেরিনটার কথা আর শোনা গেল না। লেক কারডাল বা আশপাশের কোথাও না। রাস্তার সেই মোটর এবং উপকূলের জাহাজের মত উধাও হয়ে গেল সাবমেরিনটাও। আমি ও মি. ওয়ার্ড এই সমস্যা নিয়ে অনেকবার আলোচনা করলাম। আমাদের অনেক স্পাই তল্লাশি চালাল। কিন্তু ব্যর্থ হলো সবাই।

২৭ জুন সকালবেলা মি. ওয়ার্ড ডেকে পাঠালেন আমাকে। বললেন, 'স্ট্রক, এবার তোমার প্রতিশোধ নেয়ার একটা দারুণ সুযোগ এসেছে।'

'গ্রেট আইরীতে আমার ব্যর্থতার প্রতিশোধ?'

'অবশ্যই।'

'কি সুযোগ?' জানতে চাইলাম আমি। বুঝলাম না কথাটা তিনি সত্যি সত্যি বলছেন, নাকি আমার সাথে রসিকতা করছেন।

'কেন? মেশিনটার আবিষ্কর্তাকে তুমি খুঁজে বের করতে চাও না?'

'নিশ্চয় চাই, স্যার। আমাকে কাজটার দায়িত্ব দেন, আমি এই অসম্ভবকে সম্ভব করব। তবে কাজটা খুব কঠিন, এটা ঠিক।'

'তাতে সন্দেহ নেই, স্ট্রক। এই কাজটা হয়তো গ্রেট আইরীতে ঢোকার চেয়েও কঠিন।'

মি. ওয়ার্ড যে আমার ব্যর্থতার ব্যাপারে খোঁচা মারছেন, সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। তবে এ খোঁচা নির্দয়তার প্রকাশ নয়। খোঁচা মেরে আমাকে তাতিয়ে তুলতে চাইছেন, যাতে আমি নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিছু না বলে তাঁর নতুন নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম।

এবার ঠাট্টা বাদ দিয়ে আন্তরিক স্বরে মি. ওয়ার্ড বললেন, 'আমি তোমাকে ভাল করেই চিনি, স্ট্রক। মানুষের শক্তিতে যতক্ষণ কুলোয়, চেষ্টা ছেড়ো না তুমি। তারপরও যদি ব্যর্থ হও, সেজন্যে তোমাকে দোষ দেয়া যায় না। কিন্তু এখন আমরা যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি, গ্রেট আইরীর ঘটনার সাথে তার বিরাট পার্থক্য। সরকার যদি চান, গ্রেট আইরীর রহস্য জানতেই হবে, তাহলে সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। কয়েক হাজার ডলার খরচ করলেই খুলে যাবে গ্রেট আইরীর দরজা।'

'আমারও তো একই কথা।'

'তবে এখন সব কাজ ছেড়ে এই অসাধারণ বৈজ্ঞানিকটির পেছনে লাগা উচিত। তিনি বারবার আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছেন। তাকে ধরতে গেলে একজন ডিটেকটিভের প্রয়োজন। একজন ওস্তাদ ডিটেকটিভ।'

'তাঁর কি আর কোন খবর পাওয়া গেছে?'

'না। হিসেবমত লেক কারডালেই তাঁর থাকা উচিত। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁর পাত্তা পাওয়া যায়নি। যে কেউ ভাবতে পারে, গায়েব হয়ে যাবার ক্ষমতাও তাঁর আছে।'

'আমার মনে হচ্ছে, তিনি নিজে ইচ্ছে করে দেখা না দিলে কেউ তাঁকে দেখতে পাবে না।'

'ঠিকই বলেছ। তাই আমার ঘুরে ফিরে শুধু মনে হচ্ছে, তাঁর সাথে দেখা করার একটা মাত্র পথই আছে। এমন মোটা টাকার লোভ তাঁকে দেখাতে হবে, যেন তিনি তাঁর আবিষ্কারটি বিক্রি করতে অবশ্যই রাজি হন।'

ঠিক চিন্তাই করেছেন মি. ওয়ার্ড। সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে লোকটার সাথে দেখা করতে। রাজি হয়েছে মোটা টাকা দিতে। প্রতিটা খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছে সে সংবাদ। ফলে এই ভদ্রলোকটিও নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, সরকারের ইচ্ছেটা কি। এখন যত খুশি দাম হাঁকতে পারবেন তিনি।

মি. ওয়ার্ড বললেন, 'এ আবিষ্কার যখন মানুষের ব্যক্তিগত কাজে লাগবে না, তখন তিনি নিজেই বা এটা রেখে কি করবেন? তাঁর উচিত মেশিনটা বিক্রি করে দেয়া। নাকি তিনি একজন ভয়ঙ্কর অপরাধী, তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন নাগালের বাইরে?'

এবার তাঁকে ধরার জন্যে কতরকম চেষ্টা করা হচ্ছে তার একটা বিবরণ দিলেন চীফ। এমনও হতে পারে, মারাত্মক কোন কায়দা দেখাতে গিয়ে ভদ্রলোক তাঁর মেশিনসহ শেষ হয়ে গেছেন। সেক্ষেত্রে, ভাঙা যন্ত্রটা পেলেও অনেক উপকার হবে যন্ত্রবিজ্ঞানের। কিন্তু লেক কারডালে মারকেলের সাথে দুর্ঘটনা ঘটার পর ওটার আর কোন সংবাদই পাওয়া যায়নি।

মি. ওয়ার্ড যে এ ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন আর হতাশ হয়ে পড়েছেন, সেটা স্পষ্টই বুঝলাম। উদ্বিগ্ন ভাব তো থাকবেই। জনসাধারণকে নির্ভয়ে রাখা তাঁর কর্তব্য। সেটা তো তিনি পারছেনই না, বরং বিষয়টা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। কিন্তু ডাঙায় বা পানিতে এত বেগে চললে তাকে ধরা যাবেই বা কি করে? মহাসাগরের তল দিয়ে তো আর পিছু নেয়া যাবে না। তাছাড়া বেলুনের যে উন্নতি হয়েছে, এখন আবার বেলুনে করে ওটার সন্ধানে না বের হতে হয়। তাহলে কি একদিন আমরা চরম অসহায় অবস্থার মুখোমুখি হব? পুলিস অফিসাররা যদি এরকম অকেজো হয়ে পড়ে তাহলে জনসাধারণ নিশ্চয় একদিন ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে আমাদের।

দিন পনেরো আগে পাওয়া চিঠিটার কথা মনে পড়ল। চিঠিটাতে আমার স্বাধীনতা, এমনকি জীবন বিপন্ন করার হুমকি পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। আমার ওপর সেই গুপ্তচরগিরি করার কথা মনে পড়ল। এসব কথা কি মি. ওয়ার্ডকে বলব? কিন্তু বর্তমান সমস্যার সাথে সেই চিঠি বা গুপ্তচরের কি সম্পর্ক? গ্রেট আইরীতে অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা আর না থাকায় সরকার ও ব্যাপারে মাথা ঘামানো একদম বাদ দিয়েছে। আমাকে তারা এখন এই সমস্যার সাথে জড়িত করতে চাচ্ছে। সুতরাং এসব ঘটনা চীফকে পরে একসময় বললেই চলবে।

আবার বলে চললেন মি. ওয়ার্ড। 'এই আবিষ্কারকটির সাথে যোগাযোগের

একটা পথ আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। এখন তিনি উধাও হয়েছেন। কিন্তু দেশের যে কোন অঞ্চলে যে কোন মুহূর্তে আবার তাঁকে দেখা যেতে পারে। এবার খবর পাবার সাথে সাথে তাঁর পিছু নেবে। তৈরি থেকো, যে কোন মুহূর্তে তোমাকে ওয়াশিংটন ছাড়তে হতে পারে। শুধু হেডকোয়ার্টারে আসা ছাড়া বাড়ি থেকে নড়বে না। এখানে আসার আগে টেলিফোন করে আসবে। আর এসেই প্রথম আমাকে খবর দেবে।'

'ঠিক আছে,' জবাব দিলাম আমি। 'শুধু একটা কথা জানতে চাই। কাজটা কি আমাকে একা করতে হবে নাকি দু'একজন—'

'আমি ঠিক করেছি,' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন চীফ, 'দু'জন লোক তুমি পাবে। যে দু'জনকে তুমি সবচেয়ে যোগ্য মনে করো, তাদের তুমি বেছে নাও।'

'বেশ। এবার বলুন, তাঁকে খুঁজে পেলে কি করব?'

'কিছুতেই চোখের আড়াল হতে দেবে না। যদি অসুবিধে হয়, অ্যারেস্ট করবে। তোমাকে আমি একটা ওয়ারেন্ট দেব।'

'আরেকটা কথা। যদি তিনি হঠাৎ ঝুরে ভীষণ বেগে ছুটতে শুরু করেন, তখন? দুশো মাইল বেগে ছোটার ক্ষমতা তো আমার নেই!'

'যেভাবেই হোক, বাধা দেবে। অ্যারেস্ট করেই আমাকে টেলিগ্রাম পাঠাবে। তারপর যা করার আমি করব।'

'দিনে বা রাতে যে কোন মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি থাকব আমি। এতবড় মিশনের ভার আমার হাতে দিয়েছেন, সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। যদি সফল হতে পারি তাহলে বিরাট সম্মান—'

'শুধু সম্মান নয়, অনেক লাভও আছে,' বলে আমাকে বিদায় করলেন চীফ।

বাড়ি ফিরে অনির্দিষ্টকালের জন্যে যাতে বেরিয়ে পড়তে পারি, সেরকম গোছগাছ সেরে নিলাম। বুড়ি বোধহয় ভাবল, আমি আবার গ্রেট আইরীতে চলেছি। ওর মতে, গ্রেট আইরীর পাশেই আছে নরক। বুড়ি অবশ্য কিছু বলল না। কিন্তু কাজকর্ম করতে লাগল খুবই হতাশ মুখে। জানি, ওকে কিছু বললে সে কথা বেরোবে না। তবু চুপ করে রইলাম। বিরাট এই মিশনের কথা কারও কাছেই ফাঁস করতে চাই না।

দু'জন সাথী বেছে নিলাম। ওরা আমার ডিপার্টমেন্টেরই লোক। বহু মিশনে আমার সাথে গেছে। ওদের শক্তি, সাহস, বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে আমি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। একজন ইলিনয়ের জন হার্ট, তিরিশ বছর বয়েস। আরেকজনের বয়েস বত্রিশ, ম্যাসাচুসেটসের ন্যাব ওয়াকার। এদের চেয়ে ভাল ডিটেকটিভ পুলিস বিভাগে আর নেই।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। মোটর, জাহাজ বা সাবমেরিন কোনটারই খবর পেলাম না। গুজব এল অনেক। খবরের কাগজের চটকদার তথ্য নিয়ে মাথা ঘামালাম না আমরা। বেশির ভাগ খবরেরই কোন ভিত্তি নেই। চাঞ্চল্যকর খবর হলে যে কোন পত্রিকা ছাপিয়ে দেয়। সবচেয়ে বড় পত্রিকাগুলোতেও এসব ব্যাপারে সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের বালাই নেই।

এরপরই দু'দুটো খবর এল। খবর দুটো বিশ্বাসযোগ্য। এসেছে প্রত্যক্ষদর্শীর

কাছ থেকে। প্রথম খবরটা এল লিটন রকের কাছের আরকানশাস থেকে। দ্বিতীয়জন বলল, সে তাকে দেখেছে লেক সুপিরিয়রের একেবারে মাঝখান থেকে।

দুর্ভাগ্যবশত, খবর দুটোকে মেলানো যায় না। একজন মেশিনটাকে দেখে ২৬ জুন বিকেলবেলা। আরেকজন ওটাকে দেখেছে ওই একই দিন সন্ধ্যায়। তা কি করে হয়! জায়গা দুটোর ব্যবধান আটশো মাইলের কম নয়। ধরা যাক, মোটর গাড়িটার যে অবিশ্বাস্য গতি তাতে এই দূরত্ব ওই সময়ে পেরোনো সম্ভব। কিন্তু এতটা পথ পেরোতে ওটা আর কারও চোখে পড়ল না, তা কি হতে পারে? আরকানশাস, মিসৌরী, আইওয়া, উইসকনসিন পেরিয়ে গেল একের পর এক, অথচ আমাদের কোন এজেন্টের চোখে পড়ল না? কোন কৌতূহলী লোকের চোখে পড়লেও তো সে দৌড়ে গিয়ে টেলিফোন মারফত খবরটা আমাদের জানাত।

দু'বার দেখা দিয়ে আবার উধাও হয়ে গেল মেশিনটা। মি. ওয়ার্ড কিন্তু খবর পেয়েও দু'জায়গার কোথাও আমাদের যেতে বললেন না।

তবে মেশিনটা যে নষ্ট হয়ে যায়নি, এটা বোঝা গেল। সুতরাং আমাদের কিছু একটা করা দরকার। জুলাই মাসের ৩ তারিখে একটা সরকারী বিজ্ঞপ্তি বেরোল যুক্তরাষ্ট্রের সবগুলো কাগজে। বিজ্ঞপ্তিটা এরকম:

'চলতি বছরের এপ্রিল মাসে পেনসিলভেনিয়া, কেনটাকি, ওহাইয়ো, টেনেসি, মিসৌরী, ইলিনয়ের রাস্তা দিয়ে মোটরগাড়ি গিয়েছিল। ৩০ মে উইসকনসিনে আমেরিকান অটোমোবাইল ক্লাবের মোটর রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন গাড়িটাকে আবার দেখা গিয়েছিল। তারপর সেটা উধাও হয়ে যায়।

'জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে নিউ ইংল্যান্ডের উপকূলে, কেপ কড আর কেপ সেবলের মাঝামাঝি এবং বিশেষ করে বোস্টনের আশপাশে একটা বোটকে প্রচণ্ড বেগে পানিতে ছুটতে দেখা যায়। তারপর অদৃশ্য হয়ে যায় সেটাও।

'জুন মাসেরই শেষের দিকে কানশাসের লেক কারডালে পানির নিচ দিয়ে ছোটাছুটি করে একটা সাবমেরিন। তারপর সে সাবমেরিনও গায়েব হয়ে যায়।

'সবকিছু মিলিয়ে মনে হয়, একজনই তিনটে যন্ত্র তৈরি করেছেন। অথবা তিনটে আসলে একই যন্ত্র। তৈরি করা হয়েছে জলে-স্থলে সমানভাবে চলার উপযোগী করে।

'আবিষ্কারক যিনিই হন, তাঁর যন্ত্রের দখল নেয়া হবে, এই মর্মে তাঁর উদ্দেশে একটা প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে।

'সরকারের অনুরোধ, তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করেন। আর কি শর্তে তিনি যন্ত্রটা সরকারের হাতে তুলে দেবেন, সেটাও জানান। আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তিনি যেন অবিলম্বে ওয়াশিংটনের ফেডারাল পুলিস বিভাগে তাঁর জবাব পাঠিয়ে দেন।'

প্রতিটা খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে ছাপা হলো এই বিজ্ঞপ্তি। আবিষ্কারক ভদ্রলোক যেখানেই থাকুন, বিজ্ঞপ্তিটা তাঁর চোখে পড়বেই। তিনি এটা পড়বেন। আর পড়লে কিছু একটা উত্তর নিশ্চয় দেবেন। সরকারের এরকম একটা নিঃশর্ত প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ার মত বোকামি নিশ্চয় তিনি করবেন না। উত্তর আসবেই। এখন শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা সেই উত্তরের।

জনসাধারণের কৌতূহল এবার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা ভীড় করতে লাগল পুলিস ব্যুরোর সামনে। খোঁজ করতে লাগল, চিঠি বা টেলিগ্রাম এসেছে কিনা। বাঘা বাঘা সাংবাদিকরাও হাজির রইলেন। বিখ্যাত এই সংবাদ যে কাগজে প্রথম প্রকাশিত হবে, রাতারাতি বেড়ে যাবে সেটার সম্মান। বাণিজ্যও কম হবে না। অজ্ঞাতনামা সেই আবিষ্কারকের নাম-ধাম জানা যাবে! জানা যাবে তিনি সরকারের সাথে চুক্তিতে আসতে রাজি কিনা! ওহ্, সে কি উত্তেজনা! বিখ্যাত জিনিসের জন্যে কি করতে হয়, সেটা আমেরিকার জানা আছে। ওই বিস্ময়কর আবিষ্কারককে হাত করতে যে কোন অঙ্কের খরচ করতে সরকার পিছপা হবে না। যদি প্রয়োজন হয়, দেশের সব কোটিপতি তাঁদের হাত উপুড় করে দেবেন।

একটা দিন গেল। কৌতূহলী জনসাধারণের কাছে সময় যেন কাটতেই চায় না। দিন যেন চব্বিশ ঘণ্টার চেয়ে বেশি লম্বা হয়ে গেছে। প্রত্যেক ঘণ্টা কাটছে ষাট মিনিটের অনেক বেশি সময় নিয়ে। কিন্তু কোন জবাব, চিঠি বা টেলিগ্রাম কিছুই এল না। তার পরের দুটো দিনও একইভাবে কাটল।

এদিকে এই বিজ্ঞপ্তির অন্যরকম একটা প্রতিক্রিয়া হল। ইউরোপ ও অন্যান্য মহাদেশ জেনে গেল আমেরিকার অভিপ্রায়। ওল্ড ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন শক্তিবর্গও এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের দখল পেতে উঠে পড়ে লাগল। যে যন্ত্র হস্তগত করলে এতটা সুবিধে তার পেছনে কেনই বা তারা ছুটবে না? কোটি টাকার ছড়াছড়িতে তারা কি হেরে যাবে?

মোট কথা, ওল্ড ওয়ার্ল্ডের সবগুলো শক্তিশালী রাষ্ট্র ঝাঁপিয়ে পড়ল এই প্রতিযোগিতায়। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, ইটালি, অস্ট্রিয়া, জার্মানী কেউ বাদ গেল না। অর্থবল কম, শুধুমাত্র এই সব রাষ্ট্রই প্রতিযোগিতা থেকে সরে থাকল। তারা জানে, এই রথী মহারথীদের ভীড়ে তাদের কোন সম্ভাবনা নেই।

ইউরোপিয়ান কাগজগুলোতেও আমেরিকার মত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলো। অসাধারণ সেই বৈজ্ঞানিক শুধু মুখ খুলুন। তাহলে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী ভ্যান্ডারবিল্ট, অ্যাসটর, গুল্ড, মরগান, রথসচাইল্ডদের চেয়েও বেশি অর্থের মালিক হবেন তিনি।

কিন্তু এত কিছুর পরও যখন চুপ করে রইলেন ভদ্রলোক, তখন শুরু হলো দর কষাকষি। টাকার লোভ দেখিয়ে তার গোপন তথ্য বের করে নেয়ার চেষ্টা চলল। সারা পৃথিবী যেন পরিণত হলো একটা খোলা বাজারে। রূপান্তরিত হলো নিলাম ঘরে। পৃথিবীর নিলামের ইতিহাসে এরকম ডাকাডাকির ঘটনা বিরল। খবরের কাগজ দিনে দু'বার করে বেরোতে লাগল। তাতে ছাপা হতে লাগল, দাম কত উঠছে। মিলিয়নের পর মিলিয়ন ডাক পড়তে লাগল। দর কষাকষি শেষ হলো আমেরিকার কংগ্রেসের রায় শোনার পর। একটা স্মরণীয় অধিবেশনে ভোট নেয়ার পর স্থির হলো তাঁরা দু'কোটি ডলার দিতে রাজি আছেন। একটা মেশিন কেনার জন্যে এত অর্থ ব্যয়ের সিদ্ধান্তে একজন আমেরিকানও প্রতিবাদ করল না। মেশিনটা বিস্ময়কর, তাছাড়া অন্য রাষ্ট্র যদি এটা আমেরিকার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়, তাহলে মান-ইজ্জতের প্রশ্ন।

আমি বুড়িকে বললাম, 'ওই মেশিনের দাম দু'কোটি ডলারেরও বেশি।'

অন্য কোন দেশ অবশ্য যন্ত্রটার ব্যাপারে আমেরিকার মত এত গুরুত্ব দিল না। ফলে, দু'কোটি ডলারের আশপাশে দাম হাঁকল না কেউ। শেষমেষ ওদের কাগজগুলো মতামত দিল, বড় বড় রাষ্ট্রের মধ্যে এই অযথা খামচা-খামচির কোন অর্থ আছে? এত টাকা ছড়াছড়ি কাকে নিয়ে? আদতে ওরকম বৈজ্ঞানিকই নেই কেউ। আমেরিকার কাগজগুলোর যতসব গালগল্প!

এইভাবে কাটতে লাগল দিনের পর দিন। মানুষটার আর খবর পাওয়া গেল না। কোন জবাবও দিলেন না তিনি। তাঁর মেশিনটাকেও দেখা গেল না আর কোথাও। আমি বুঝতে পারলাম না, এ অবস্থায় কি করা উচিত। এই অদ্ভুত রহস্যের কোন সমাধানই মাথায় এল না। ধীরে ধীরে হতাশ হয়ে পড়তে লাগলাম।

১৫ জুলাই সকালবেলা পুলিস ব্যুরোর চিঠির বাক্সে পাওয়া গেল একটা চিঠি। চিঠিটার কোথাও পোস্ট অফিসের ছাপ নেই। কর্তৃপক্ষ চিঠিটা পড়ে পাঠিয়ে দিলেন ওয়াশিংটনের কাগজগুলোতে। সেখানে চিঠিটার হুবহু নকল ছাপা হলো বিশেষ সংখ্যায়।

চিঠিটা এইরূপ:

নয়

টেরর-এর ডেক
১৫ জুলাই

নিউ এবং ওল্ড ওয়ার্ল্ডের প্রতি,

'ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে অনেক প্রস্তাব আমি পেয়েছি। সবাই দিয়েছেন প্রচুর টাকার প্রস্তাব, যার শীর্ষে আছে আমেরিকা সরকার। আমার উত্তর একটাই:

'আমার আবিষ্কারের ব্যাপারে দর কষাকষি করে লাভ হবে না। আপনাদের সমস্ত প্রস্তাব আমি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করছি।

'ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা—কেউই পাবে না আমার মেশিন।

'এই আবিষ্কার আমার। এবং এটা আমার দখলেই থাকবে। যখন খুশি, যেভাবে খুশি এটাকে ব্যবহার করব আমি।

'এই মেশিন দিয়ে সারা পৃথিবীকে আমি আমার পদানত করব। পৃথিবীর মানুষের আওতার মধ্যে এমন কোন ক্ষমতা নেই যা দিয়ে আমাকে ঠেকানো যাবে। কোন অবস্থাতেই আমাকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারও নেই।

'আমাকে থামানোর বা অ্যারেস্ট করার চেষ্টা হবে বৃথা। অসম্ভব। কেউ আমার গায়ে আঁচড় কাটার চেষ্টা করলে তার হাজার গুণ ক্ষতি করব আমি।

'আমাকে যে টাকার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তাতে আমি থুথু দিই! টাকার প্রয়োজন নেই আমার। যদি কখনও প্রয়োজন হয়, শুধু হাত বাড়ানোর অপেক্ষা।

হাতের মুঠোয় এসে পড়বে কোটি কোটি টাকা।

'নিউ এবং ওল্ড ওয়ার্ল্ডের সবাই চোখ কান খোলা রেখে শুনে রাখুন: আমার চুল পরিমাণ ক্ষতি করার ক্ষমতা আপনাদের কারও নেই। অথচ আমি আপনাদের পুতুলের মত নাচাতে পারি। যা খুশি তাই করতে পারি।

'আমি নিজেকে যা ভাবি, সেই নামেই শেষ করছি চিঠি।'

মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড

দশ

এরকম একটা চিঠি লেখা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে উদ্দেশ্য করে। পুলিসের চিঠির বাক্সে এ চিঠি কে ফেলে গেল, তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

সারারাত আমাদের অফিসের সামনে লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত গিজ গিজ করেছে মানুষ। ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, কৌতূহলী মানুষ। এই ভীড়ে একজন খুব সহজেই সবার চোখ বাঁচিয়ে চিঠিটা ফেলে যেতে পারে। রাতটা ছিল ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। রাস্তার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত দেখা যায়নি।

এ ধরনের চিঠি পেলে সবাই ভাবে, কেউ ইয়ার্কি করেছে। পাঁচ সপ্তাহ আগে গ্রেট আইরী থেকে চিঠিটা পেয়ে আমিও তাই ভেবেছি।

কিন্তু এ চিঠির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া হলো ঠিক তার উল্টো। ওয়াশিংটন বা আমেরিকার অন্যান্য অঞ্চলে কেউ এটাকে রসিকতা ভাবল না। কিছু লোক এটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু দেশসুদ্ধ সবাই হাঁ হাঁ করে উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। বলেছে, এই চিঠির ভাষা বা লেখার ধরন কোনটাই ইয়ার্কির নয়। একজনই মাত্র এরকম চিঠি লিখতে পারেন। লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে যাওয়া সেই মেশিনের আবিষ্কর্তা।

সবাই যে একবাক্যে এটাকে মেনে নিল তার কারণ আছে। আবিষ্কারক ভদ্রলোকটির মনের গড়ন যে আলাদা জাতের তা স্পষ্টই বোঝা যায়। অদ্ভুত যে ঘটনাগুলো এতদিন যাবৎ একের পর এক ঘটে চলেছে, সেগুলো কেন ঘটেছে তার ইঙ্গিত আছে চিঠিটার মধ্যেই। মাঝে মাঝে গা ঢাকা দিয়েছেন ভদ্রলোক। এক জায়গায় আত্মপ্রকাশ করে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন, নতুন রূপে আরেক জায়গায় আত্মপ্রকাশ করে সে চাঞ্চল্যের মাত্রা বাড়িয়েছেন। দুর্ঘটনায় মরা তো দূরের কথা, বরং এমন এক জায়গায় লুকিয়ে থেকেছেন, যেখানে যাওয়ার সাধ্যও হয়নি পুলিসের। তারপর পৃথিবীর সব রাষ্ট্রপ্রধানকে চিঠি মারফত পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, কি তাঁর উদ্দেশ্য। অন্য কোন পোস্ট অফিসে চিঠি ফেললে পাছে তাঁর ঠিকানা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই তিনি এসেছিলেন ওয়াশিংটনে। সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যেখানে তাঁকে আসতে বলেছিল, সেখানেই তিনি এসেছিলেন। পুলিস ব্যুরোর সামনে।

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চিঠি লিখে সারা পৃথিবীতে হুলস্থুল ফেলে দেয়া। তাঁর সে

উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। যেদিন চিঠিটা ছাপা হলো সেদিন খবরের কাগজ খুলেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল সারা দেশের লোকের। বারবার করে পড়েও তারা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।

আমি নিজেও চিঠিটার প্রত্যেকটা শব্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম। হাতের লেখাটা কড়া, কুটিল। কোন হস্তলিপিবিশারদ এই চিঠি দেখলে নিঃসন্দেহে বলবেন, এটার লেখক বদমেজাজী, কঠোর মনোভাবাপন্ন আর অসামাজিক। আচমকা অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল আমার গলা দিয়ে। কপাল ভাল, বুড়ির কানে গেল না। আশ্চর্য! এই সাদৃশ্য তো আরও আগেই আমার চোখে পড়া উচিত ছিল। মরগ্যানটন থেকে যে চিঠি পেয়েছিলাম সেটার সাথে এই চিঠিটার হাতের লেখা যে হুবহু মিলে যাচ্ছে!

আরেকটা সাদৃশ্য চোখে পড়ল আমার। মরগ্যানটন থেকে লেখা চিঠিটার শেষে নামের পরিবর্তে ছিল শুধু তিনটে অক্ষর—এম. ও. ডব্লু. অর্থাৎ মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড!

দ্বিতীয় চিঠিটা এসেছে টেররের ডেক থেকে। সেং থ্রী-ইন ওয়ান মেশিনের নাম তাহলে—টেরর। অর্থাৎ কিনা আতঙ্ক। মেশিনের চালকই লিখেছেন এই চিঠি। তিনিই আমাকে হুমকি দিয়েছেন যেন গ্রেট আইরীতে আর কখনও না যাই।

উঠে ডেস্ক থেকে ১৩ জুনের চিঠিটা বের করলাম। মিলিয়ে দেখলাম। না। আর কোন সন্দেহ নেই। দুটো চিঠিরই হাতের লেখা একদম এক।

বন বন করে মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল চিন্তা। দুটো চিঠি থেকে একটা সিদ্ধান্তই মেলে। অবশ্য এ সিদ্ধান্ত আর কারও মাথায় আসা সম্ভব নয়। কারণ প্রথম চিঠিটার কথা আর কেউ জানে না। আমাকে যিনি হুমকি দিয়েছেন তিনিই তাহলে টেররের কমান্ডার। নামটাও দিয়েছেন বড় সার্থক—টেরর। আতঙ্ক। মনে মনে ভাবলাম, যাক অন্তত একটা সূত্র পাওয়া গেল। এবার আর হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে না। আমাদের লোকজনকে লাগিয়ে দিলে কি খুলে যাবে না এই রহস্যের জট? মোট কথা, দুটো প্রশ্ন এখন আমাদের সামনে। এক, টেরর আর গ্রেট আইরীর মধ্যে সম্পর্কটা কোথায়? দুই, ব্লুরিজ পর্বতমালায় ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ঘটনাবলীর সাথে ততোধিক অদ্ভুত এই মেশিনের ঘটনাবলীর সম্পর্কটা কোথায়?

আমি জানি, এখন আমার কি করা উচিত। চিঠিটা পকেটে ঢুকিয়ে সোজা ছুটলাম পুলিস হেডকোয়ার্টারের দিকে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, মি. ওয়ার্ড ঘরেই আছেন। ছুটলাম তাঁর ঘরের দিকে।

ঘরে ঢুকে দেখি, তাঁর সামনে বিছানো একটা চিঠি। এটা কাগজে প্রকাশিত চিঠির নকল নয়। পুলিস ডাকবাক্সে পাওয়া একেবারে আসল চিঠিটা। আমাকে দেখে মুখ তুললেন তিনি।

'তোমার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ কোন খবর এনেছ।'

'দেখলেই বুঝতে পারবেন,' বলে পকেট থেকে চিঠিটা বের করে তাঁর সামনে রাখলাম।

মি. ওয়ার্ড চিঠিটা তুলে নিয়ে এক নজর দেখেই বললেন, 'কি এটা?'

'দেখতেই পাচ্ছেন, নামের বদলে মাত্র তিনটে অক্ষর দিয়ে লেখা একটা চিঠি।'

'কোথা থেকে এসেছে এটা?'
'নর্থ ক্যারোলিনার মরগ্যানটন থেকে।'
'তুমি কবে পেয়েছ?'
'একমাস আগে। ১৫ জুন।'
'তখন এই চিঠি পেয়ে কি ভেবেছিলে?'
'তামাশা।'
'আর এখন?'
'আমি যা ভাবছি, আপনিও তাই ভাববেন। চিঠিটা পড়লেই সব বুঝতে পারবেন।'
খুব মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়লেন চীফ। তারপর বললেন, 'মাত্র তিনটে অক্ষর।'
'হ্যাঁ। ওই অক্ষর তিনটের অর্থ—মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড।'
'এটা আসল চিঠি,' তাঁর সামনের চিঠিটা তুলে ধরে দেখালেন তিনি।
'মনে হচ্ছে না দুটো চিঠি একই হাতের লেখা?'
'তাই তো মনে হচ্ছে।'
'দেখেছেন, গ্রেট আইরী থেকে কি হুমকিটা আমাকে দেয়া হয়েছে?'
'হ্যাঁ, মৃত্যুর হুমকি। কিন্তু এ চিঠি তুমি পেয়েছ এক মাস আগে। এতদিন দেখাওনি কেন, স্ট্রক?'
'ভেবেছি ওটার কোন গুরুত্ব নেই, তাই। আজ টেররের কমান্ডারের চিঠিটা পড়ে মনে হলো, গুরুত্ব আছে।'
'ঠিকই বলেছ। চিঠিটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। মনে হয়, এই চিঠির সূত্র ধরে এগোলে অদ্ভুত লোকটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।'
'আমারও তাই মনে হয়, স্যার।'
'কিন্তু একটা কথা। টেরর আর গ্রেট আইরীর মধ্যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে?'
'জানি না; কল্পনাও করতে পারছি না।'
'একটা সম্পর্ক থাকতে পারে, যদিও তা অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব।'
'কি সেটা?'
'আবিষ্কর্তা গ্রেট আইরীতে থাকেন। ওই জায়গাটাই তিনি বেছে নিয়েছেন যন্ত্রপাতির কারখানা হিসাবে।'
'অসম্ভব,' বললাম আমি। 'যন্ত্রপাতি নিয়ে তিনি ওখানে গেলেন কোন দিক দিয়ে? মেশিন তৈরির পর বের করেই বা নিয়ে এলেন কোন পথে? গ্রেট আইরী আমি নিজের চোখে দেখেছি, স্যার। আপনি যা বলছেন তা একেবারেই অসম্ভব।'
'সম্ভব হতে পারে, স্ট্রক। যদি—'
'যদি?'
'ধরো, যদি তাঁর মেশিনে পাখা থাকে, যার দ্বারা তিনি উড়ে চলে যান গ্রেট আইরীর মধ্যে।'
হতবাক হয়ে গেলাম আমি। যে টেরর পানির নিচে সাবমেরিনের মত ঘোরাফেরা করে, সেটা শকুন বা ঈগলের সাথে পাল্লা দিয়ে উড়তেও পারে! শ্রাগ

করে বুঝিয়ে দিলাম, এ কথা আমার কাছে অবিশ্বাস্য। মি. ওয়ার্ডের মুখ দেখে বুঝলাম, তিনি নিজেও যে খুব একটা বিশ্বাস করেন, তা নয়। এসব গাঁজাখুরি কল্পনার কোন মানে হয় না।

আবার তিনি মিলিয়ে দেখলেন চিঠি দুটো। পরীক্ষা করলেন মাইক্রোসকোপ দিয়ে। চিঠি দুটো যে শুধু একই হাতের লেখা তাই নয়, লেখা হয়েছে একই কলমে।

চুপচাপ কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন মি. ওয়ার্ড। তারপর বললেন, 'তোমার চিঠিটা আমার কাছে থাক। মনে হচ্ছে, অদ্ভুত এই ঘটনার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছ তুমি। দুটো ঘটনার মধ্যে কি যোগসূত্র আছে এখনও বুঝতে পারছি না। তবে যোগ আছে, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তুমি প্রথমটার সাথে জড়িয়ে পড়েছ। এখন যদি দ্বিতীয়টার সাথেও জড়িয়ে পড়ো, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

'আমারও তাই মনে হয়, স্যার। আপনি তো জানেন, এ ব্যাপারে কতখানি কৌতূহলী হয়ে পড়েছি।'

'জানি। সব বুঝতে পারছি আমি। তাই আবার বলছি, যে কোন মুহূর্তে ওয়াশিংটন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি থেকো।'

এদিকে চিঠির প্রতিক্রিয়ায় সারাদিন ধরে জনসাধারণের উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে চলল। গণ-উত্তেজনার ধরন দেখে চিন্তিত হলেন সরকার। হোয়াইট হাউস ও কংগ্রেসে ঝড় বয়ে গেল। জনগণের যা অবস্থা, কিছু একটা তো না করলেই নয়। কিন্তু কিছু একটা করা দরকার, এটা যত সহজে বোঝা যাচ্ছে, কাজটা করা অত সহজ নয়। কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে এই মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ডকে? যদিও বা পাওয়া যায়, গ্রেপ্তার করা যাবে কিভাবে? তাঁর ক্ষমতার যা নমুনা পাওয়া গেছে তাতেই হিমশিম অবস্থা। কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি অজ্ঞাত ক্ষমতা নিশ্চয় তাঁর আছে। পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি লেক কারডালে গেলেন কিভাবে? ওখান থেকে পালিয়েই বা গেলেন কোন পথে? তাছাড়া, লেক সুপিরিয়রে যদি তাঁকে দেখা গিয়ে থাকে, তাহলে অতটা পথ তিনি লোকের চোখে ধুলো দিয়ে গেলেন কিভাবে?

এমন এক ঘটনা যে একেবারে পাগল হওয়ার দশা! ঘটনা যতই জটিল আকার ধারণ করল, ততই একেবারে শেষ পর্যন্ত দেখার সাধ হলো। কোটি কোটি ডলারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। সুতরাং গায়ের জোর খাটাতে হবে। আবিষ্কার ও আবিষ্কর্তা কোনটাকেই কেনা যাবে না। তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার ধরনটাও কি উদ্ধত আর ভয়ঙ্কর!

সরকার ভাবল, বেশ, হয়ে থাক শক্তি পরীক্ষা! সমাজ ও মানুষের এই শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া হোক সর্বশক্তি নিয়ে। আর কারও ক্ষতি করার আগেই কেড়ে নেয়া হোক তাঁর ক্ষমতা। একবার ভাবা হয়েছিল, তিনি মারা গেছেন। এখন বোঝা যাচ্ছে কতখানি অসার এ চিন্তা। তিনি যে শুধু বেঁচে আছেন তাই নয়, তাঁর বেঁচে থাকাটাই জনসাধারণের প্রতি একটা সার্বক্ষণিক হুমকি স্বরূপ।

জনসাধারণের চাপে সরকার একটা ঘোষণা দিতে বাধ্য হলেন। ঘোষণাটি নিম্নরূপ:

'যেহেতু টেররের কমান্ডার তাঁর আবিষ্কার জনসমক্ষে আনতে বা বিক্রি করতে নারাজ এবং যেহেতু তাঁর মেশিন জনগণের মহা বিপদের কারণ হতে পারে, সেহেতু

দেশের আইন তাঁকে রক্ষা করতে অপারগ। তাঁকে বা তাঁর মেশিনকে যে কোন উপায়ে আটক বা ধ্বংস করার পূর্ণ অধিকার সরকারের তরফ থেকে দেয়া হলো। শুধু তাই নয়, যিনি এ কাজ করতে পারবেন তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে।'

সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল। 'মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড' গোটা আমেরিকাকে অবজ্ঞা করে হুমকি দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত চলবে এই যুদ্ধ।

একদিনেই ধাপে ধাপে বাড়তে লাগল পুরস্কারের অঙ্ক। বিপজ্জনক এই বৈজ্ঞানিকের ঘাঁটির সন্ধান যে দিতে পারবে, যে তাঁর মুখোস খুলে দিতে পারবে অথবা যে তাঁকে খতম করে সারা দেশবাসীকে মহাবিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে, তাকে দেয়া হবে বিরাট পুরস্কার।

এইরকম পরিস্থিতি দাঁড়াল জুলাই মাসের শেষ নাগাদ, সবকিছু ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর উপায় রইল না। আউট-ল লোকটিকে দেখামাত্র সতর্ক করে দিতে হবে সবাইকে। তারপর সুযোগ মত অ্যারেস্ট করতে হবে। মোটরে বা জাহাজে থাকাকালীন তাঁকে কিছুতেই ধরা যাবে না। সুতরাং প্রচণ্ড বেগে পালানোর আগেই আচমকা অ্যারেস্ট করতে হবে তাঁকে। কিছুতেই যেন তিনি উধাও হতে না পারেন, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

তৈরি হয়ে রইলাম আমি। মি. ওয়ার্ডের আদেশ পাবার সাথে সাথে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু আদেশ আর আসে না। আসবেই বা কি করে? যাঁর জন্যে তৈরি হয়ে থাকা, তাঁরই কোন পাত্তা নেই।

জুলাই মাস প্রায় শেষ হয়ে এল। খবরের কাগজগুলো এখনও সমানে গুলগল্প ছাপিয়ে চলেছে। যত রকমের গুজব সব ঠাঁই পাচ্ছে সেখানে। নতুন নতুন সূত্রের খবর বেরোচ্ছে। কিন্তু সব বাজে, ভিত্তিহীন। আমেরিকার সমস্ত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার টেলিগ্রাম আসছে পুলিস ব্যুরোতে। কিন্তু কোনটার সাথে কোনটা মিলছে না। একজন যা বলেছে, আরেকজন বলছে ঠিক তার উল্টোটা। ফলে এসব খবর বাতিল করে দিতে হচ্ছে। এত পুরস্কার ঘোষণা করেও কোন ফলই পাওয়া গেল না। মাত্রা বেড়ে গেল শুধু নালিশ আর ভুল ধারণার। মহাজটিল আকার ধারণ করল সমস্যা। সরল বিশ্বাসে ভুল করে বসল অনেকে। কোথাও ধুলো পাক দিয়ে উঠলেই ভাবল সেই মোটরগাড়ি। আবার কখনও আমেরিকার হাজার হাজার হ্রদের কোথাও ঢেউ একটু ফুলে উঠলেই উত্তেজিত হয়ে উঠল সাবমেরিন ভেবে। সত্যি কথা বলতে কি, জনসাধারণ উত্তেজিত হলে এরকমই হয়। চারপাশ থেকে তাড়া করে বেড়ায় কল্পনার ভূত।

অবশেষে ২৯ জুলাই একটা টেলিফোন পেলাম। অবিলম্বে দেখা করতে বলেছেন মি. ওয়ার্ড।

দেখা হবার সাথে সাথে বললেন, 'স্ট্রক, এক ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে বেরোতে হবে।'

'কোথায়?'

'টলেডো।'

'ওটাকে দেখা গেছে নাকি?'

'হ্যাঁ। এখনি টলেডো রওনা হও। ওখানে পৌঁছলেই চূড়ান্ত নির্দেশ পাবে।'

'ঠিক আছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই রওনা হচ্ছি আমরা।'
'গুড! এবার ফর্মাল অর্ডারটা শোনো।'
'বলুন।'
'যেভাবেই হোক, এবার সফল হতেই হবে!'

এগারো

ধরা ছোঁয়ার বাইরের সেই কমান্ডারকে তাহলে আবার দেখা গেছে আমেরিকার মাটিতে! তাঁকে কখনও ইউরোপে দেখা যায়নি।

না স্থলপথে, না জলপথে। তিনি কখনও আটলান্টিক পেরোননি। অথচ এটা তাঁর কাছে মাত্র তিনদিনের ব্যাপার। তিনি কি শুধু আমেরিকার ওপর হুমকি চালাতে চান? তাহলে—তাহলে কি তিনি নিজেই একজন আমেরিকান?

এই কথাটা আমার কেন মনে হলো, বুঝিয়ে বলছি। ওল্ড আর নিউ ওয়ার্ল্ডের মাঝে যে মহাসাগর, এই মেশিন সেটা অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারে। দ্রুততম জাহাজের চেয়েও বেশি গতি থাকায় এটা শুধু তাড়াতাড়িই যাবে না, যাত্রাপথের ঝড়ঝঞ্ঝাকেও এড়িয়ে যেতে পারবে অনায়াসেই। পানির নিচ দিয়ে যাওয়ার ফলে প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়ের কবল থেকেও এই মেশিন নিরাপদ।

তবু তিনি আটলান্টিক পেরিয়ে ইউরোপ চলে যাননি। তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চাইলে সম্ভবত ওহায়োতেই করা যাবে। টলেডো তো ওহায়োরই একটা শহর।

এবার কিন্তু মেশিনের আবির্ভাব নিয়ে কোন হৈ-চৈ হলো না। খবরটা যাতে গোপন থাকে সে ব্যাপারে আগে থেকেই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। খবর এসেছে এজেন্ট মারফত। আমি চলেছি সেই এজেন্টের সাথে দেখা করতে। এই খবর মোটা টাকা দিয়ে কিনত খবরের কাগজগুলো। কিন্তু পুলিস সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত খবরটা গোপন রাখা হবে। আমরাও টুঁ শব্দ করব না এ বিষয়ে।

যাঁর কাছে চলেছি, তাঁর নাম আর্থার ওয়েলস। তিনি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন টলেডোতে। শহরটা লেক ইরির পশ্চিম পাশে অবস্থিত। পশ্চিম ভার্জিনিয়া আর ওহায়োর ভেতর দিয়ে সারারাত ছুটে চলল আমাদের ট্রেন। একটুও লেট না করে পরদিন ঠিক দুপুরের আগে পৌঁছুল টলেডোতে।

জন হার্ট, ন্যাব ওয়াকার এবং আমি নামলাম ট্রেন থেকে। হাতে ট্রাভেলিং ব্যাগ। পকেটে রিভলভার। আক্রমণ বা আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্রের দরকার হতে পারে। নামার প্রায় সাথে সাথে চিনতে পারলাম অপেক্ষমাণ লোকটিকে। আমার মতই অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করে কৌতূহলী চোখে প্রত্যেকটা যাত্রীকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন তিনি।

কাছে গিয়ে বললাম, 'মি. ওয়েলস?'
'মি. স্ট্রক?' জানতে চাইলেন তিনি।
'হ্যাঁ।'

'বলুন, এখন কি করতে চান।'

'টলেডোতে থাকার দরকার আছে?'

'সবকিছু আপনার নির্দেশে হবে, মি. স্ট্রক। আপনি যদি মনে করেন দরকার নেই, তাহলে নেই। স্টেশনের বাইরে দু'ঘোড়ার একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সময় নষ্ট না করে এখনি তাহলে গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়া যাক।'

'তাই দেব,' সাথী দু'জনকে ইশারা করে জবাব দিলাম আমি। 'জায়গাটা খুব দূরে নাকি?'

'বিশ মাইল।'

'নাম কি?'

'ব্ল্যাক রক ক্রীক।'

একটা হোটেলে ব্যাগগুলো রেখে রওনা দিলাম আমরা। গাড়ির সীটের নিচে খাবারের পরিমাণ দেখে অবাক হলাম। যা মজুত আছে, বেশ কয়েকদিন চলে যাবে। মি. ওয়েলস বললেন, ব্ল্যাক রক ক্রীকের চারপাশটা এই অঞ্চলের সবচেয়ে বুনো এলাকা। কৃষক বা জেলেদের আকৃষ্ট করার মত কিছুই নেই। খাবার জন্যে কোন সরাইখানা বা ঘুমোনোর জন্যে শোবার ঘর পর্যন্ত নেই। ভাগ্য ভাল, এটা জুলাই মাস। গরম এখন কম। দু'একরাত খোলা আকাশের নিচে শুলে এমন কিছু যাবে আসবে না।

তাছাড়া, যদি আমরা সফল হই তাহলে হয়তো বেশিক্ষণ থাকতে হবে না। হয় টেররের কমান্ডার সতর্ক হবার আগেই আমাদের হাতে ধরা পড়ে বেকুব বনে যাবেন, অথবা বিদ্যুৎগতিতে কেটে পড়বেন। অ্যারেস্ট করার সমস্ত আশা-ভরসা শেষ হয়ে যাবে আমাদের।

বছর চল্লিশেক বয়েস হবে আর্থার ওয়েলসের। বিশাল, শক্তিশালী শরীর। এঁর সুনাম আগেই শুনেছি। স্থানীয় পুলিস এজেন্টদের মধ্যে ইনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ। বিপদে মাথা একদম ঠাণ্ডা থাকে। জীবন বিপন্ন করে বহুবার বিপদের মোকাবিলা করেছেন এই দুঃসাহসিক মানুষটি। টলেডোতে গিয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটা কাজ হাতে নিয়ে। বরাতজোরে টেররের দেখা পেয়ে যান।

লেক ইরির পাড় বরাবর আমরা ছুটে চললাম দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। এই হ্রদ আমেরিকার উত্তর প্রান্তে। এটার একপাশে কানাডা। আরেকপাশে ওহায়ো, পেনসিলভেনিয়া আর নিউ ইয়র্ক।

লেক ইরির আয়তন প্রায় দশ হাজার বর্গমাইল। উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ছ'হাজার ফুট। পশ্চিমের বড় বড় লেকের পানি ডেট্রয়েট নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উত্তর-পশ্চিমে এসে মিলিত হয়েছে ইরির সাথে। তাছাড়া রকি, কুয়াহোগা, ব্ল্যাক—এসব লেক ইরির নিজস্ব নদী। তবে এই নদীগুলো বিশেষ নাম করা নয়। উত্তর-পুবে নায়াগ্রা নদী হয়ে লেক ইরির পানি আছড়ে পড়ছে লেক ওন্টারিও-তে। এটাই বিশ্ববিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাত।

যতদূর জানা যায়, লেক ইরির সর্বোচ্চ গভীরতা হলো একশো তিরিশ ফুট। সুতরাং এটার জলসীমা নেহাত কম নয়। সবচেয়ে চমৎকার লেকগুলো এই অঞ্চলেই আছে। স্থলভাগ খুব বেশি উত্তরে নয়। তবু উত্তর মেরুর হিমেল বাতাস

মাঝে মাঝে হাড় জমিয়ে দেয়। উত্তর দিকের স্থলভাগ নিচু হওয়ার ফলে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসে শীতের বাতাস। তাই কখনও কখনও লেক ইরির এপার থেকে ওপার জমে যায় বরফে।

বেশ কিছু প্রধান শহর গড়ে উঠেছে বিরাট এই হ্রদের পাড়ে। পুবে নিউ ইয়র্কের বাফেলো। পশ্চিমে টলেডো। দক্ষিণে ওহায়োর অন্তর্গত ক্লিভল্যান্ড ও স্যানডাসকি। তীর বরাবর অসংখ্য ছোট শহর, গ্রাম আছে। যানবাহন এখানে স্বভাবতই বেশি, তা থেকে বার্ষিক আয় বিশ লাখ ডলারেরও বেশি।

লেকের পাড় বরাবর স্বল্প ব্যবহৃত এবড়ো-খেবড়ো একটা রাস্তা দিয়ে চলেছে আমাদের গাড়ি। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো বলে চলেছেন আর্থার ওয়েলস।

২৭ জুলাই বিকেলবেলা ঘোড়ায় চেপে তিনি যাচ্ছিলেন হার্লি শহরের দিকে। শহরের পাঁচ মাইল বাইরের ছোট একটা বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ অনেক দূরে হ্রদের পানির নিচ থেকে ভেসে উঠল একটা সাবমেরিন। সাথে সাথে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন তিনি। ঘোড়াটাকে বেঁধে পা টিপে টিপে গিয়ে উপস্থিত হলেন হ্রদের কিনারে। একটা গাছের পেছনে লুকিয়ে স্বচক্ষে দেখলেন, সাবমেরিনটা ধীরে ধীরে এগিয়ে ব্ল্যাক রক ক্রীকের মোহনায় গিয়ে থামল। অবাক হয়ে ভাবলেন ওয়েলস, এটাই কি সেই বিখ্যাত মেশিন, সারা পৃথিবী যার খোঁজ করছে!

সাবমেরিনটা পাহাড়ের নিকটবর্তী হতেই দু'জন লোক ডেকের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে তীরে নামল। এই দু'জনের একজনই কি মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড? লেক সুপিরিয়রে উধাও হয়ে যাবার পর তাঁকে তো আর দেখা যায়নি। লেক ইরির তলদেশ থেকে ভেসে ওঠা এই সাবমেরিনই কি সেই রহস্যময় টেরর?

'আমি একেবারে একা ছিলাম,' বললেন ওয়েলস। 'আপনারা সেসময় আমার সাথে থাকলে চারজন মিলে ওদের দু'জনকে আর সাবমেরিনে করে পালাতে দিতাম না।'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'কিন্তু সাবমেরিনে আর কেউ ছিল না? তবে, ওদের দু'জনকে ধরতে পারলেও কাজ হত। অন্তত নাম-ধাম আর কিছু গোপন তথ্য তো জানা যেত।'

'আর, দু'জনের একজন যদি হত টেররের ক্যাপ্টেন, তাহলে তো কথাই ছিল না!'

'আমার শুধু একটাই ভয় করছে, ওয়েলস। আপনি ক্রীক ছেড়ে যাবার পর সাবমেরিনটাও কেটে পড়েনি তো?'

'কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সবকিছু জানা যাবে। হে ঈশ্বর, ওরা যেন এখনও থাকে। তারপর রাত নামলেই—'

'একটা কথা। আপনি কি রাত নামা পর্যন্ত ওদের ওপর নজর রেখেছিলেন?'

'না। ঘণ্টাখানেক দেখার পর সোজা টলেডোর টেলিগ্রাফ স্টেশনের দিকে রওনা দিই। আমি যখন সেখানে পৌঁছি, তখন অনেক রাত। পৌঁছেই ওয়াশিংটনে জরুরী তার করে দিই।'

'অর্থাৎ পরশু রাতে। তারপর, গতকাল কি আবার গিয়েছিলেন ব্ল্যাক রক ক্রীকে?'

'হ্যাঁ।'

'সাবমেরিন তখনও ছিল?'

'হ্যাঁ! যেখানে দেখে গিয়েছিলাম সেখানেই।'

'লোক দুটো?'

'ছিল। মনে হলো, অ্যাকসিডেন্টে কলকব্জা নষ্ট হয়েছে। তাই মেরামত করার জন্যে এসেছে এই নির্জন জায়গায়।'

'বোধহয়। হয়তো এমন কিছু নষ্ট হয়েছে যার ফলে সাধারণত যে ঘাঁটিতে লুকোয়, সেখানে যেতে পারেনি। শুধু ভাবছি, এখনও ওরা আছে কিনা!'

'আমার মনে হয় আছে। কারণ সাবমেরিন থেকে অনেক জিনিসপত্র বের করে তীরের ওপর রেখেছিল ওরা। তাছাড়া দূর থেকে যতটা মনে হলো, ডেকের ওপরেও কি যেন মেরামত চলছিল।'

'শুধু দু'জনকেই দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। ওই দু'জনই।'

'কিন্তু যে মেশিন এত জটিল, যেটা এই এখন মোটরগাড়ি, ওই তখন জাহাজ বা সাবমেরিন হচ্ছে, তাছাড়া এত যার স্পীড, সেটাকে কি মাত্র দু'জন মিলে চালানো সম্ভব?'

'আমারও মনে হয়, এটা অসম্ভব, মি. স্ট্রক। কিন্তু আমি মাত্র ওই দু'জনকেই দেখেছি। আমি যেখানে লুকিয়েছিলাম, বেশ কয়েকবার তার কাছাকাছি এসেছিল ওরা। জ্বালানি কাঠকুটো কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে রাখছিল তীরের ওপর। এমনিতেই এই অঞ্চলে মানুষজন নেই। তাছাড়া লেক থেকে ক্রীক দেখাও যায় না। সুতরাং ওদের কেউ দেখে ফেলার সম্ভাবনা খুব কম। মনে হলো, ওরা তা জানে।'

'লোক দুটোকে আবার দেখলে চিনতে পারবেন?'

'অবশ্যই পারব। একজন মাঝারি আকারের শক্তিশালী লোক। খুব চটপটে, মুখে দাড়ির জঙ্গল। আরেকজন বেঁটে কিন্তু গাট্টাগোট্টা পেটা শরীর। গতকাল আগের দিনের মতই পাঁচটা নাগাদ বন থেকে বেরিয়ে টলেডো এসেছিলাম। এসেই মি. ওয়ার্ডের একটা টেলিগ্রাম পেলাম—আপনি আসছেন। তারপর তো স্টেশনে গেলাম আপনাদের আনার জন্যে।'

ওয়েলসের সব কথা জড়ো করলে এইরকম দাঁড়ায়: সম্ভবত আমরা যে সাবমেরিনটাকে খুঁজছি, সেটাকে চল্লিশ ঘণ্টা আগে ব্ল্যাক রক ক্রীকে মেরামত করতে দেখা গেছে। মেরামত খুব জরুরী হয়ে পড়েছিল বলেই বোধহয় সাবমেরিনটা ভেসে উঠেছিল। আশা করি আমরা গিয়ে ওটাকে একই জায়গায় দেখব। কিন্তু ওটা লেক ইরিতে ঢুকল কিভাবে?

অনেক আলোচনার পর আমি আর ওয়েলস একমত হলাম, ওটার পক্ষে তে এরকম জায়গাই উপযুক্ত। সবশেষে ওটাকে দেখা গিয়েছিল লেক সুপিরিয়রে সেখান থেকে লেক ইরি আসতে হলে তাকে আসতে হত মিশিগানের রাস্তা দিয়ে কিন্তু ওই অঞ্চলে পুলিস ও জনসাধারণ কড়া নজর রাখা সত্ত্বেও এটা কারও চোখে পড়েনি। সুতরাং জলপথেই এটা এসেছে। লেক সুপিরিয়র আর লেক ইরির মাঝে গ্রেট লেকের অজস্র হ্রদ আর নদী ছড়িয়ে আছে। এই ধরনের একটা সাবমেরিন

অনায়াসেই সে পথ ধরে আসতে পারে সবার চোখ বাঁচিয়ে।

এখন আমরা গিয়ে যদি দেখি ক্রীক ছেড়ে চলে গেছে টেরর, কিংবা তাদের ধরার চেষ্টা করতেই যদি পালিয়ে যায়, তাহলে কোন্ পথে যাবে? যে পথেই যাক, কিছুতেই ওটার পিছু নেয়া যাবে না। লেক ইরির প্রান্তসীমার পোর্ট বাফেলোতে দুটো টর্পেডো ডেস্ট্রয়ার আছে। ওয়াশিংটন থেকে রওনা দেয়ার আগেই মি. ওয়ার্ড আমাকে এ খবর দিয়েছিলেন। তিনি ওই দুটোর কমান্ডারকেও টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলেন, যেকোন মুহূর্তে টেররকে ধাওয়া করার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু টর্পেডো ডেস্ট্রয়ারের গতি যতই হোক, টেররের পিছু নেয়ার ক্ষমতা তার নেই। তাছাড়া সাবমেরিনটা যদি ডুব দেয় তাহলে হাত-পা কামড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। ওয়েলস বললেন, লড়াই শুরু হলে টর্পেডো ডেস্ট্রয়ার কিছু করতে পারবে না। তা সাথে যত নাবিক আর কামানই থাক। তার মানে, আজ রাতে যদি আমরা সফল না হই, ভেস্তে যাবে সমস্ত অভিযান।

ব্ল্যাক রক ক্রীকের বনজঙ্গলে প্রায় শিকার করতে আসেন ওয়েলস। ফলে এই এলাকার সব পথঘাটই তাঁর চেনা। প্রায় সারা লেকই তীক্ষ্ণ পাথরে ঘেরা। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাথরের গায়ে। প্রণালীটা তিরিশ ফুট মত গভীর। টেরর পানির ওপরে বা নিচে যেখানে ইচ্ছে থাকতে পারে। দু'তিন জায়গায় পাথর নেই। বালুকা বেলা চলে গেছে ছোট ছোট গিরিসঙ্কটের দিকে। গিরিসঙ্কটগুলো দু'তিনশো ফুট ওপরে উঠে মিলিত হয়েছে বনের সীমানায়।

সন্ধ্যা সাতটায় আমাদের গাড়ি বনে ঢুকল। তখনও যথেষ্ট আলো বনের ভেতরে। গাছের ছায়া থাকা সত্ত্বেও পথ চিনতে অসুবিধে হলো না। সোজাসুজি ক্রীকের কিনারায় যাওয়া যাবে না। টেররের লোক দু'জন আমাদের দেখতে পেলে ভেগে যাবে।

'আমাদের বোধহয় এখানেই থামা উচিত, তাই না?' জানতে চাইলাম ওয়েলসের কাছে।

'না,' জবাব দিলেন তিনি। 'গভীর বনে গিয়ে গাড়ি ছাড়তে হবে। তাহলে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।'

'গাছের নিচ দিয়ে গাড়ি যাবে তো?'

'যাবে। আমি এই বনের আগাগোড়া চিনি। পাঁচ-ছ'শো ফুট সামনে একটা খোলা জায়গা আছে। সেখানে আমরা একদম গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারব। ঘোড়াগুলোও খাবার পাবে। অন্ধকার গাঢ় হলেই ক্রীকের মোহনা আগলে দাঁড়িয়ে আছে যে পাহাড়, সেটার তীরে চলে যাব আমরা। জায়গাটা টেরর আর তার পালাবার পথের ঠিক মাঝখানে। এখন শুধু টেরর থাকলেই হয়।'

আমরা সবাই আক্রমণ করার জন্যে একদম প্রস্তুত। কিন্তু ওয়েলস যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন। রাত নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। ততক্ষণ হাতের কাজগুলো সেরে নেয়া যাক। লাগাম ধরে টানতেই ঘোড়াগুলো এগুলো খালি গাড়ি নিয়ে। ক্রমেই আমরা চললাম গভীর বনের দিকে। চারপাশে ছড়ানো লম্বা পাইন, বিশাল ওক আর সাইপ্রেস। ফলে অনেক ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার। পায়ের তলায় লতা, পাইন কাঁটা আর মরা পাতার দঙ্গল। মাথার ওপরে গাছপালা এত ঘন, পড়ন্ত

সূর্যের শেষ রশ্মি আর প্রবেশাধিকার পাচ্ছে না। আন্দাজে এগিয়ে চলেছি হাতড়াতে হাতড়াতে। কয়েকবার গাড়ি ধাক্কা খেলো এখানে-সেখানে। মিনিট দশেক পর পৌঁছলাম খোলা জায়গাটায়।

ঘন সবুজ ঘাসে জায়গাটা ভরা। চারপাশ ঘিরে বিশাল সব গাছের সারি। এখনও দিনের আলোর কিছুটা অবশিষ্ট আছে। খানিকটা বিশ্রাম নেয়া যাবে। এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে রাস্তা দিয়ে আসতে গা-হাত-পা ব্যথা ধরে গেছে।

আমাদের সবার ভেতর কৌতূহল মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, এখনি ক্রীকে গিয়ে টেররকে একনজর দেখি। কিন্তু শুভ বুদ্ধি আমাদের বেঁধে রাখল। আর সামান্য অপেক্ষা। তারপরই নামবে অন্ধকার। তখন অনায়াসেই যেতে পারব টেররের কাছে। ওয়েলস এই ব্যাপারে গোঁ ধরে রইলেন। ভেতরটা কৌতূহলে ফেটে পড়লেও বুঝতে পারলাম, কথাটা ঠিক।

ঘোড়াগুলোর সাজপোশাক খুলে কোচোয়ান ওদের নিয়ে গেল ঘাসপাতা খাওয়াতে। হার্ট আর ওয়াকার খাবার-দাবার সাজাতে লাগল চমৎকার একটা সাইপ্রেসের তলায়। বনের মিষ্টি গন্ধ এসে নাকে লাগছে। মনে পড়ে গেল মরগ্যানটন আর প্লেজ্যান্ট গার্ডেনের কথা। খুব খিদে পেয়েছিল আমাদের। খাবারও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। খাওয়া-দাওয়া সারলাম। কিন্তু তখনও নামেনি অন্ধকার। এদিকে উত্তেজনায় ছটফট করছি আমরা। শেষমেষ পাইপ ধরালাম বাকি সময়টা কাটাবার জন্যে।

বন জুড়ে স্তব্ধতা নেমে এসেছে। ডেকে ডেকে ফিরে গেছে শেষ পাখিটিও। রাত নামার সাথে সাথে ক্রমেই কমে আসছে বাতাস। মগডালের পাতাগুলোও নড়ছে কি নড়ছে না। সূর্য অস্ত যেতেই দ্রুত কালো হয়ে এল আকাশ। গোধূলি হারিয়ে গেল আঁধারের গহ্বরে।

ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে আটটা বাজে। বললাম, 'সময় হয়েছে, ওয়েলস।'

'আপনি বললেই উঠব।'

'তাহলে উঠে পড়ুন।'

কোচোয়ানকে সতর্ক করে দিলাম। ঘোড়াগুলো যেন চরতে চরতে ফাঁকা জায়গাটার বাইরে না যায়। শুরু হলো আমাদের অভিযান। সবচেয়ে আগে চললেন ওয়েলস। তাঁর পেছনে আমি। আমার পেছনে হার্ট আর ওয়াকার। ওয়েলস পথ দেখিয়ে না চললে গাঢ় এই অন্ধকারে এক ধাপও এগোতে পারতাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেলাম। সামনেই ব্ল্যাক রক ক্রীকের তীর।

চারদিক নিস্তব্ধ। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই কোথাও। নির্ভয়ে এগোতে পারব আমরা। টের যদি এখনও থাকে তাহলে নিশ্চয় নোঙর ফেলেছে পাথরের আড়ালে। কিন্তু, সত্যিই আছে তো? এই একটা প্রশ্নই শুধু লটকে আছে আমাদের সামনে। রহস্যময় ঘটনার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পড়েছি আমরা। শিরায় শিরায় রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হাতুড়ি পেটা শুরু হয়েছে বুকের মধ্যে।

ইশারায় এগোতে বললেন ওয়েলস। পায়ের নিচে খসখস করতে লাগল বালি। আর মাত্র দুশো ফুট সামনেই ক্রীকের মোহনা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিঃশব্দে গিয়ে উপস্থিত হলাম লেকের পাড়ের পাথরের ওপরে। দৃষ্টি মেলে দিলাম সামনে।

কেউ নেই! কিছু নেই!

চব্বিশ ঘণ্টা আগে যেখানে টেররকে দেখেছিলেন ওয়েলস, খাঁ খাঁ করছে জায়গাটা। ব্ল্যাক রক ক্রীক ছেড়ে চলে গেছেন মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড।

বারো

মানুষ মাত্রই মরীচিকা দেখে। ওয়েলস গতকাল টেররকে দেখেছিলেন। কিন্তু এখন আর সেটা নেই। কলকব্জা নষ্ট হয়ে গোপন ঘাঁটিতে যেতে না পারায় ব্ল্যাক রক ক্রীকে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। মেরামত সেরে এতক্ষণে নিশ্চয় চলে গেছে লেক ইরি ছেড়ে অনেক দূরে।

অভিযানের শুরু থেকে বারবার এই ভয়টাই করেছি। অথচ শেষের দিকে এসে প্রায় বিশ্বাস করে বসেছিলাম, টেররের দেখা আমরা পাবই। ওয়েলস যেখানে দেখেছেন সেখানেই এখনও নোঙর ফেলে আছে টেরর।

হতাশায় ভেতরটা ভেঙে পড়তে চাইল। আমাদের এত খাটুনির ফুটো পয়সা মূল্যও আর রইল না। আর টেরর যদি এখনও এই লেকেই থেকে থাকে তাহলেই বা কি করার আছে? ওটাকে ধরা তো আমাদের সাধ্যের বাইরে। আসলে ওটাকে ধরার ক্ষমতা পৃথিবীর কোন মানুষেরই নেই।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি আর ওয়েলস। হার্ট, ওয়াকারও কম হতাশ হয়নি। তবু ওরা ক্রীকের তীর বরাবর ঘোরাঘুরি করে দেখল, যদি বা ফেলে যাওয়া কোন সূত্র মেলে।

আমি আর ওয়েলস পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম ক্রীকের মোহনায়। টুঁ শব্দ করলাম না কেউ। আমাদের মনের অবস্থা বোঝানোর জন্যে কোন কথা বলার দরকার ছিল না। প্রচণ্ড আগ্রহের পর এই হতাশা একেবারে শেষ করে ফেলল আমাদের। এত পরিকল্পনার এই পরিণতিতে মাথা যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। অভিযান স্থগিত করব নাকি চালিয়ে যাব, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

প্রায় এক ঘণ্টা ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম। জায়গাটা ছেড়ে চলে আসার মত শক্তিও যেন আর অবশিষ্ট নেই। এখনও অন্ধকার ভেদ করে দেখার চেষ্টা করছি। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের মাথায় চকচক করে উঠছে পানি। চমকে উঠে ভাবছি, ওই বুঝি টেরর। কিন্তু তখনি মিলিয়ে যাচ্ছে পানির ঝিকিমিকি। কখনও মনে হচ্ছে, গাঢ় অন্ধকারের গায়ে ছায়ার মত কি যেন দেখতে পাচ্ছি। জাহাজের মত কালো কি যেন একটা এগিয়ে আসছে এদিকেই। আবার কখনও ঘূর্ণিজল ছলাৎ করে এসে পড়ছে পায়ের ওপর। মনে হচ্ছে, কি যেন তোলপাড় করছে লেকের তলে। কল্পনার এরকম দৃশ্য একের পর এক চলে গেল চোখের সামনে দিয়ে। সব মিথ্যা! মরীচিকা!

অবশেষে আমাদের সঙ্গী দু'জন ফিরে এল। আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, 'কিছু পেলে?'

'না,' জবাব দিল জন হার্ট।

'ক্রীকের দুই তীরই দেখেছ?'

'হ্যাঁ,' বলল ন্যাব ওয়াকার। 'সাঁতার না কেটে যতদূর যাওয়া যায়, গেছি। মি. ওয়েলস তীরের ওপর ছড়ানো অনেক জিনিস দেখেছিলেন। আমরা তার কিছু দেখতে পেলাম না।'

বনে ফিরে যাবার চিন্তা মাথায় নেই। তাই বললাম, 'এখানে কিছুক্ষণ থাকি।'

হঠাৎ তোলপাড় করে উঠল পানি। ঢেউ ফুলে ফেঁপে ছুটে এল তীরের দিকে।

ওয়েলস বললেন, 'বড় নৌকো গেলে এরকম ঢেউ ওঠে।'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি, নিজের অজান্তেই নিচু হয়ে গেছে স্বর। 'কিন্তু ঢেউটা এল কোথা থেকে? এক ফোঁটা বাতাস বইছে না। তাহলে কি লেকের ওপর কিছু ভেসে উঠেছে?'

'নাকি তলে কিছু আছে?' সামনে ঝুঁকে ঢেউয়ের ধরন দেখতে দেখতে বললেন ওয়েলস।

ঢেউটা নৌকোর ঢেউয়ের মতই। মনে হচ্ছে, পানির নিচ দিয়ে বা ওপর দিয়ে কিছু একটা এগিয়ে আসছে ক্রীকের দিকে।

নিঃশব্দে, নিশ্চল হয়ে কিছু একটা দেখার আশায় চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলাম নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। ক্রীকের তীরে আলতো চাপড় মারছে লেকের ঢেউ। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে সে শব্দ। হার্ট আর ওয়াকার খানিকটা সরে গিয়ে বড় একটা পাথরের ওপর উঠে দাঁড়াল। আমি এগিয়ে গেলাম পানির আরও কাছে। তোলপাড়ের শব্দ তো কমছে না! বরং বাড়ছে! সেই সাথে কানে এল; একটা ধক-ধক-ধক-ধক শব্দ।

আমার দিকে ঝুঁকে ওয়েলস বললেন, 'আর কোন সন্দেহ নেই। এদিকেই এগিয়ে আসছে একটা জাহাজ।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। লেক ইরিতে তিমি বা হাঙর থাকলে অবশ্য অন্য কথা।'

'না, এটা জাহাজেরই শব্দ। কিন্তু জাহাজটা ক্রীকের মোহনার দিকে আসছে নাকি চলে যাচ্ছে অন্যদিকে?'

'আপনি তো এখানেই জাহাজটাকে দু'বার দেখেছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, এখানেই।'

'এটা যদি সেই জাহাজটাই হয়, তাহলে ফিরেও আসবে এখানেই।'

'ওই যে!' আঙুল দিয়ে ক্রীকের প্রবেশ পথটা দেখালেন তিনি।

ফিরে এসেছে ওয়াকার আর হার্ট। চারজনই হামাগুড়ি দিয়ে রইলাম বালির ওপর।

মনে হলো, আঁধার ভেদ করে এদিকেই আসছে একটা কালো স্তূপ। লেকের ওপর দিয়ে খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এখনও ক্রীকে ঢোকেনি। উত্তর-পুবে একশো বিশ ফুট মত দূরে আছে ওটা। এঞ্জিনের শব্দও আর কানে আসছে না। ওরা বোধহয় এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছে। যে গতি জড়ো হয়েছিল এগিয়ে আসছে এখন তারই ধাক্কায়।

এটা বোধহয় ওয়েলসের দেখা সেই সাবমেরিন। ক্রীকের আশ্রয়ে রাত

কাটানোর জন্যে ফিরে আসছে।

কিন্তু ফিরেই যদি আসবে তাহলে নোঙর তুলেছিল কেন? আবার কলকব্জা বিগড়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে? নাকি মেরামত শেষ হবার আগেই গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছিল? এখনই বা কি কারণে ওটা এখানে ফিরে আসছে? ওহায়োর রাস্তা দিয়ে তো বিদ্যুৎগতিতে উধাও হয়ে যেতে পারত। তাহলে কি ওটা মোটর গাড়িতে রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে?

মেলা প্রশ্ন ভীড় করে এল মাথার মধ্যে, যার একটারও উত্তর জানা নেই আমার। আমি আর ওয়েলস ভাবতে লাগলাম, এটা কি সত্যিই সেই টেরর? এটার কমান্ডারই মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড নামে হুমকি দিয়েছিলেন সরকারকে? নিশ্চিত হবার মত প্রমাণ এখনও হাতে আসেনি।

মনে হচ্ছে, ব্ল্যাক রক ক্রীকের সমস্ত এলাকা এই জাহাজের ক্যাপ্টেনের নখদর্পণে। নইলে এত গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আসতে পারতেন না। কোন কেবিন থেকে এক বিন্দু আলোও বাইরে এসে পড়ছে না।

খানিক পরেই খুব ধীরে মেশিন চলার মত শব্দ পেলাম। আবার আলোড়িত হয়ে উঠল লেকের পানি। তারপরই ঘাটে ভিড়ল জাহাজটা।

পায়ের নিচের পাঁচ-ছ'ফুট উঁচু সমতল পাথরটা খাড়া নেমে গেছে পানিতে। ঠিক একটা জাহাজঘাটের মতই।

আমার এক হাত চেপে ধরলেন ওয়েলস। ফিসফিস করে বললেন, 'আর এখানে থাকা উচিত হবে না।'

'হ্যাঁ। ওরা দেখে ফেলতে পারে। বালির ওপর গুঁড়ি মেরে থাকতে হবে। অথবা লুকাতে হবে কোন পাথরের ফাটলে।'

'আপনি রওনা দেন। আমরা পেছন পেছন যাচ্ছি।'

আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা ঠিক নয়। কালো স্তূপটা এখন আমাদের একেবারে কাছে। ওটার ডেকে দেখতে পাচ্ছি দু'জন মানুষের ছায়া।

সত্যিই কি সাবমেরিনে মাত্র দু'জন মানুষই আছে?

পা টিপে টিপে সরতে লাগলাম পেছনে। যেখান থেকে গিরিসঙ্কট উঠে গেছে বনের দিকে সেখানে পৌঁছলাম। চারপাশে বহু খাঁজ। একটাতে ঢুকলাম আমি আর ওয়েলস। আরেকটাতে সঙ্গী দু'জন। ওরা যদি টেরর থেকে নামে তাহলে আমরা দেখতে পাব। অথচ ওরা আমাদের দেখতে পাবে না। সুতরাং অবস্থা বুঝে ব্যবস্থাও করতে পারব আমরা।

সামান্য শব্দ ভেসে এল জাহাজ থেকে। ইংরেজিতে কিছু কথা বলাবলিও হলো। ওরা যে নোঙর ফেলতে যাচ্ছে, এটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। ডেকের ওপর থেকে কেউ ছুঁড়ে দিল একটা রশি। রশিটা সড়াৎ করে এসে পড়ল আমরা যেখানে আগে দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক সেইখানে।

ওয়েলস ঝুঁকে পড়ে দেখলেন, নাবিকদের একজন তীরে লাফিয়ে পড়ে রশি ধরেছে। তারপরই কানে এল পাথরে নোঙর ঘষার কর্কশ খর খর শব্দ।

কিছুক্ষণ পর বালির ওপর হাঁটাচলার খচমচ শব্দ হলো। লণ্ঠনের আলোয় পথ চিনে দু'জন লোক খাঁড়ি ধরে চলে গেল বনের দিকে।

কোথায় যাচ্ছে ওরা? ব্ল্যাক ক্রীকও কি তাহলে রক টেররের একটা গুপ্তঘাঁটি? খাবার ও অন্যান্য জিনিসপত্রের কি কোন মজুত আছে এখানে? খাবার নিতেই কি এসেছিল তাহলে? লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতেই কি ওরা সন্ধান পেয়েছে ব্ল্যাক রক ক্রীকের? মনে হয় জনমানবহীন এই জায়গার খবর ভালভাবেই জানে ওরা। জানে, এখানে ওদের দেখে ফেলার কেউ নেই।

'এখন কি করব আমরা?' ফিসফিস করে জানতে চাইলেন ওয়েলস।

'ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর—'

চমকে উঠে থেমে গেলাম আমি। লোক দু'জন আমাদের তিরিশ ফুট দূর দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওদের একজন মুখ ঘুরাতেই লণ্ঠনের আলোয় তার মুখ আলোকিত হয়ে উঠেছে। তাই দেখে ভীষণভাবে চমকে উঠেছি আমি।

লং স্ট্রীটে আমার বাড়ির সামনে যে দু'জন লোক দেখেছিলাম আমি, নিঃসন্দেহে এ তাদেরই একজন। বুড়ি যেমন এ মুখ ভোলেনি, তেমনি আমিও ভুলিনি। ওদের দু'জনকে কত খুঁজেছি আমি। পাইনি। যে চিঠিতে আমাকে হুমকি দেয়া হয়েছিল সেটা এদের মারফতই পেয়েছি। আর সন্দেহ নেই, এটাই সেই টেরর। তবু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। এই মেশিনের সাথে গ্রেট আইরীর কি সম্পর্ক!

আদ্যোপান্ত খুলে বললাম ওয়েলসকে। তিনি শুধু বললেন, 'সবকিছুই বড় জটিল।'

লোক দু'জন বনের পথে হাঁটতে হাঁটতে গাছের তলা থেকে কাঠ কুটো কুড়িয়ে জড়ো করছে।

'ওরা যদি আমাদের ঘাঁটি দেখে ফেলে তাহলে কি হবে?' বললেন ওয়েলস।

'ওরা যদি খুব বেশি ভেতরে ঢুকে না পড়ে তাহলে ভয়ের কিছু নেই।'

'কিন্তু যদি ভেতরে যায়? ঘোড়া, গাড়ি সব দেখে ফেলে?'

'ছুটে আসবে জাহাজের দিকে। কিন্তু জাহাজে ওঠার আগেই ধরে ফেলব আমরা।'

ক্রীকের দিক থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। পাথরের ফাটল থেকে বেরিয়ে খাঁড়ি ধরে নামতে লাগলাম ঘাটের দিকে। যেখানে নোঙর ফেলা হয়েছে সেখানটায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে টেরর। ডেকে কোন আলো নেই। ডেক বা তীরে দেখাও যাচ্ছে না কাউকে। এই তো সুযোগ। ডেকে উঠে লোক দু'জনকে অভ্যর্থনা করার জন্যে তৈরি হয়ে থাকব?

'মি. স্ট্রক!' চমকে উঠলাম। ওয়েলস। আমার পিছু পিছু কখন এসেছেন, জানতেই পারিনি।

তাড়াতাড়ি পিছু হটে গুঁড়ি মেরে বসে পড়লাম। আরও আগেই কি জাহাজে উঠে পড়া উচিত ছিল? নাকি উঠতে গেলে ডেকের ওপর থেকে দেখে ফেলত কেউ? তাহলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যেত।

লণ্ঠন হাতে লোক দু'জন খাঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। কোন সন্দেহ তাদের মনে জাগেনি। দু'জনের হাতেই একবোঝা করে কাঠ। এসে থামল ঘাটের ওপরে।

একজন সামান্য গলা চড়িয়ে ডাকল, 'হ্যালো! ক্যাপ্টেন!'

'আসছি,' জাহাজের ভেতর থেকে সাড়া দিল কেউ।

ওয়েলস আমার কানে কানে বললেন, 'ওরা তাহলে তিনজন!'

'চারজনও হতে পারে।' জবাব দিলাম আমি, 'পাঁচ বা ছ'জন হলেও অবাক হবার কিছু নেই।'

পরিস্থিতি খুব খারাপ। এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে আমরা কি করব? একটা বেচাল হলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে! লোক দু'জন তো ফিরে এসেছে। ওরা কি কাঠের বোঝাসহ আবার উঠে পড়বে জাহাজে? তারপর সাবমেরিনটা ক্রীক ছেড়ে যাবে, নাকি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? যদি এখনি চলে যায় তাহলে তো আর ধরতে পারব না। এটা লেক ইরি ছেড়ে উঠে রাস্তা ধরে চলে যেতে পারে কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভেতর দিয়ে। অথবা ডেট্রয়েট নদী ধরে লেক হুরন হয়ে গ্রেট লেকে গিয়ে পড়তে পারে। ব্ল্যাক রক ক্রীকের জলরাশি সঙ্কীর্ণ। যে সুযোগ এখানে আছে তেমনটা কি আর কোথাও পাব?

চুপি চুপি ওয়েলসকে বললাম, 'আমরা চারজন। ওরা কোন আক্রমণের জন্যে তৈরি নেই। অতর্কিত আক্রমণে ওদের বেকুব করে দেয়া যাবে। মোট কথা, আক্রমণ করব আমরা, তারপর ঈশ্বর যা করার করবেন।'

সাথের দু'জনকে ডাকতে যাচ্ছি, হাত চেপে ধরলেন ওয়েলস। বললেন, 'শুনুন।'

একজন লোক জাহাজটাকে ঘাটের আরও কাছে টেনে এনেছে। ডেক থেকে ক্যাপ্টেন বললেন, 'সব ঠিক আছে তো?'

'আছে, ক্যাপ্টেন।'

'আরও দুটো কাঠের বোঝা আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আরেকবার গেলেই সব কাঠ টেররে আনা যাবে।'

'হ্যাঁ। আরেকবার গেলেই হবে।'

'বেশ। তাহলে কাল সকালেই রওনা দেব আমরা।'

জাহাজটায় কি মাত্র তিনজন লোক? ক্যাপ্টেন অর্থাৎ মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড আর ওই দু'জন?

ওরা কি করবে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। প্রথমে কাঠগুলো তুলবে ডেকে। তারপর জাহাজের ভেতর ঢুকে সোজা ঘুম। আক্রমণ করার পক্ষে সেটাই হবে উপযুক্ত সময়। বাধা দেয়ার সুযোগ পর্যন্ত ওরা পাবে না।

ক্যাপ্টেন নিজেই জাহাজ পাহারা দিচ্ছেন। সুতরাং এখন আক্রমণ করাটা হঠকারিতা হবে। আমি আর ওয়েলস একমত হলাম, সবাই আগে ঘুমিয়ে যাক। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।

সাড়ে দশটা বাজতে আবার বালির ওপর পদশব্দ পাওয়া গেল। লণ্ঠন হাতে লোক দু'জন খাঁড়ি ধরে আবার উঠে গেল বনের দিকে। অনেকটা এগিয়ে যেতে ওয়েলসও গেলেন আমাদের সাথের দু'জনকে সাবধান করতে। আমি নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম পানির একেবারে কিনারায়।

ছোট একটা রশির প্রান্তে ভাসছে টেরর। লম্বা, পাতলা, ছুঁচল গড়ন। চিমনি,

পাল, মাস্তুল, দড়িদড়া—এসবের কোন বালাই নেই। নিউ ইংল্যান্ডের উপকূলে ছোটাছুটি করা জাহাজটার বর্ণনার সাথে এটার চেহারা মিলে যাচ্ছে।

আবার ফিরে এলাম পাথরের ফাটলে। সাথী তিনজনও লুকিয়ে আছে পাশের খাঁড়িতে। রিভলভার বের করে দেখে নিলাম আমরা।

লোক দু'জন বনে ঢুকেছে পাঁচ মিনিট হলো। যেকোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে ওরা। তারপরও ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করব। সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলে আক্রমণ চালাব। একটু সুযোগও দেয়া চলবে না। সুযোগ পেলেই লেক ইরি তোলপাড় করে ছুটে চলে যাবে টেরর। অথবা ডুব দেবে পানির তলায়।

কখনও এরকম অধৈর্য হইনি। ছটফট করতে লাগলাম, লোক দু'জন বন থেকে এখনও ফিরছে না কেন? ফেরার পথে নিশ্চয় কিছু বাধা পড়েছে।

আচমকা ভেসে এল একটা গোলমালের শব্দ। রাতের স্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল ঘোড়ার চিৎকারে। ঘোড়া দুটো পাগলের মত ছুটে চলেছে তীর বরাবর!

এ তো আমাদের ঘোড়া! কোচোয়ান ব্যাটা নিশ্চয় ঠিকমত খেয়াল রাখেনি। খোলা জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ঘোড়া দুটো। ছুটে চলেছে বালুতটের ওপর দিয়ে।

এইসময় দেখা গেল লোক দু'জনকে। চোঁ চাঁ দৌড় লাগিয়েছে। নিশ্চয় ওরা আমাদের ঘাঁটি আবিষ্কার করে ফেলেছে। সন্দেহ করেছে, পুলিস লুকিয়ে আছে বনে। পুলিস ওদের ওপর নজর রেখেছে, পিছুও নিয়েছে। এবার গ্রেপ্তার করবে। তাই মরিয়া হয়ে খাঁড়ির ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে আসছে ওরা। একবার ঘাটে পৌঁছতে পারলেই নোঙর তুলে ঝাঁপিয়ে উঠবে ডেকে। উল্কার মত উধাও হয়ে যাবে টেরর। আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ধ্বংস হয়ে যাবে। গো হারা হেরে যাব আমরা।

'ধরো,' চিৎকার করে উঠলাম আমি। তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে খাঁড়ির দু'পাশ থেকে নেমে এলাম আমরা। ওদের পথ রোধ করে দাঁড়ালাম।

আমাদের দেখার সাথে সাথে কাঠের বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দিল ওরা। রিভলভার বের করে মুহূর্তের মধ্যে গুলি চালাল। একটা গুলি লাগল হার্টের পায়ে।

আমরাও পাল্টা গুলি করলাম। কিন্তু লাগল না। সোজা ছুটে এল দু'জনেই। কোথাও হোঁচট বা আছাড় খেলো না।

ক্রীকের তীরে পৌঁছে রশি না খুলেই ঝাঁপ দিল জাহাজের ওপরে। ঝুলতে লাগল ডেক আঁকড়ে ধরে।

লাফিয়ে সামনে এগিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। হাতে রিভলভার। গুলি করলেন। ওয়েলসের গায়ে আলতো আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট।

ওয়াকার ও আমি রশিটা ধরে তীরের দিকে টানতে লাগলাম। এটাকে ঘাটে ভিড়ানোর আগেই রশি কেটে দিয়ে গায়েব হয়ে যাবে না তো?

হঠাৎ পাথরের খাঁজ থেকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেরিয়ে এল ছেঁড়া নোঙর। একটা হুক আটকে গেল আমার বেল্টে। ছুটন্ত রশির ধাক্কায় ছিটকে পড়ল ওয়াকার। রশি ও হুকের ফাঁদে আটকা পড়ে ছেঁচড়ে এগোলাম সামনে—

সবগুলো এঞ্জিন সর্বশক্তি দিয়ে গর্জে উঠল। লাফিয়ে উঠে ব্ল্যাক রক ক্রীকের পানি মথিত করে তীরের মত ছুটে বেরিয়ে গেল টেরর।

তেরো

জ্ঞান ফিরতেই চোখে পড়ল দিনের আলো। ছোট্ট একটা কেবিনে শুয়ে আছি আমি। পুরু কাঁচে ঢাকা পোর্টহোল দিয়ে সামান্য আলো ঢুকছে। কতক্ষণ ধরে এখানে শুয়ে আছি, কে-ই বা এখানে রেখে গেছে, কিছুই জানি না। তবে আলোর ভাব দেখে মনে হলো, দুপুর হয়নি এখনও।

সরু একটা বাঙ্কে শুয়ে আছি আমি। কম্বলে শরীর ঢাকা। ভেজা কাপড়-চোপড় শুকিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এক কোণে। নোঙরের হুকের হ্যাঁচকা টানে ছেঁড়া বেল্টটা পড়ে আছে মেঝেতে।

আহত হইনি আমি। কাটা ছেঁড়ার দাগও নেই। শুধু কিছুটা ক্লান্তি বোধ করছি। কোন আঘাত লেগে জ্ঞান হারাইনি। রশির সাথে জড়িয়ে পানিতে পড়ে গিয়েছিলাম। তারপর ছুটে চলেছিলাম পানির নিচ দিয়ে। এদের কেউ পানি থেকে তুলে না নিলে দম বন্ধ হয়ে মারাই যেতাম।

এখন কি আমি টেররে? ক্যাপ্টেন আর তাঁর দুই সাথী ছাড়া কি অন্য কেউ নেই? তাই হবে। সংঘর্ষের পুরো দৃশ্যটাই ভেসে উঠল চোখের সামনে। গুলি খেয়ে বালির ওপর পড়ে আছে আহত হার্ট। একের পর এক গুলি ছুঁড়ে চলেছেন ওয়েলস। হুকটা আমার বেল্টে আটকে যাবার আগে রশির ঘায়ে ছিটকে পড়ছে ওয়াকার। তাহলে ওরা কোথায়? ওরা হয়তো ভেবেছে, লেক ইরিতে পড়ে শেষ হয়ে গেছি আমি।

কিন্তু টেরর এখন কোথায়? যাচ্ছেই বা কোন পথে? এটা কি মোটরগাড়ি হয়ে ছুটে চলেছে কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভেতর দিয়ে? যদি তাই হয়, যে কয়েক ঘণ্টা আমি সংজ্ঞাহীন ছিলাম, সেই ফাঁকে এটা বহুদূর চলে এসেছে। নাকি সাবমেরিন হয়ে ছুটে চলেছে লেকের তল দিয়ে?

না। বিস্তৃত তরল কিছুর ওপর দিয়ে চলেছে টেরর। পানির তলায় ডুবে থাকলে কেবিনে সূর্যের আলো এসে পড়ত না। আর মোটর যত ভাল পথ দিয়েই যাক ঝাঁকুনি টের পাওয়া যাবেই।

তবে এটা লেক ইরিতে আছে কিনা বলা কঠিন। ডেট্রয়েট নদী হয়ে লেক হুরন বা লেক সুপিরিয়রে ঢুকে পড়তে পারে।

ঠিক করলাম, ডেকে যাব, যা হয় হবে। ওখানে গেলেই হয়তো সব বোঝা যাবে। কোনমতে টেনে-হেঁচড়ে নেমে পড়লাম বাঙ্ক থেকে। জামা-কাপড় পরলাম। তবে খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছি না। কেবিনটায় তালা দিয়ে রাখেনি তো?

একটাই পথ আছে বেরোনোর—মই বেয়ে উঠে মাথার ওপরকার হ্যাচওয়ে দিয়ে। ওপরে উঠে ঠেলা দিতেই খুলে গেল হ্যাচ। অর্ধেকটা শরীর বের করে আনলাম ডেকের ওপর।

সামনে, পেছনে, দু'পাশে তাকালাম। ছুটে চলেছে টেরর। যতদূর চোখ যায়

শুধু ঢেউ আর ঢেউ। উপকূলের চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ আর সাগরের দিগন্তরেখা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

এটা হ্রদ না সাগর তা সহজেই বোঝা যাবে। বো-তে লেগে দু'পাশে ফোয়ারার মত ছুটে যাচ্ছে পানি। কাঁটার মত ফুটছে আমার গায়ে।

পানি মুখে দিয়ে দেখলাম। মিষ্টি। তাহলে এখনও বুঝি লেক ইরিতেই আছি। সূর্য দেখে বুঝলাম, দুপুর হয়নি এখনও। অর্থাৎ ব্ল্যাক রক ক্রীক ছেড়ে আসার পর বড়জোর সাত আট ঘণ্টা কেটেছে।

আজ তাহলে ৩১ জুলাই।

লেক ইরি লম্বায় দু'শো মাইল আর চওড়ায় পঞ্চাশ মাইলেরও বেশি। অতএব ডাঙা চোখে না পড়াটা অবাক হবার মত কিছু নয়। দক্ষিণ-পুবে আমেরিকা বা উত্তর-পশ্চিমে কানাডার আভাস পর্যন্ত পাচ্ছি না।

ডেকে দু'জন লোক দেখলাম। একজন বো-তে দাঁড়িয়ে সামনের দিকটা দেখছে। আরেকজন স্টার্নে। সূর্যের অবস্থান দেখে মনে হলো, উত্তর-পুবে চলেছে টেরর। এই দু'জনই ব্ল্যাক রক ক্রীকের খাঁড়ি দিয়ে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। চারপাশে তাকালাম ক্যাপ্টেনকে দেখার জন্যে। নেই।

একেবারে অস্থির হয়ে উঠলাম। কখন দেখব এই বিস্ময়কর মেশিনের আবিষ্কর্তাকে? সেই বিরাট ব্যক্তিত্বকে, যিনি নাড়া দিয়েছেন সারা বিশ্বকে। মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড নাম নিয়ে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন সমগ্র মানবজাতিকে।

বো-তে দাঁড়ানো লোকটার পাশে গেলাম। মিনিট পাঁচেক চুপ করে থাকার পর বললাম, 'ক্যাপ্টেন কোথায়?'

আধ বোজা চোখে আমার দিকে চেয়ে দেখল লোকটা। ভাবখানা, আমার কথা বুঝতে পারেনি। কিন্তু গত রাতে ওকে ইংরেজিতে কথা বলতে শুনেছি। ব্যাপারটা কি? ডেকে যখন বেরিয়ে আসি তখনও আমাকে দেখে মোটেই অবাক হয়নি ব্যাটা। আমার দিকে পেছন ফিরে দিগন্তের দিকে চেয়ে রইল সে।

জেদ চেপে গেল আমার। এগোলাম স্টার্নের দিকে। ওই লোকটাকে জিজ্ঞেস করে দেখব। কিন্তু আমাকে ওদিকে এগোতে দেখেই হাত নেড়ে যেতে নিষেধ করল লোকটা।

ভাবলাম, কেউ যখন কথা বলতে চাইছে না তখন ঘুরে ফিরে মেশিনটাকে ভাল করে দেখব।

ধীরে সুস্থে মেশিনটার নির্মাণ কৌশল দেখতে লাগলাম। ডেক ও ডেকের ওপরকার সমস্ত জিনিস অচেনা কোন ধাতুর তৈরি। ডেকের মাঝখানে আধখোলা একটা ঢাকনি। ঢাকনির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নিচের এঞ্জিন রুম। প্রায় নিঃশব্দে, নিয়মিত ছন্দে কাজ করে চলেছে অসংখ্য কলকব্জা। আগেই দেখেছি, এবারও খেয়াল করলাম পাল, মাস্তুল, দড়িদড়া কিচ্ছু নেই। পতাকা ওড়াবার জন্যে স্টার্নে কোন দণ্ড পর্যন্ত নেই। বো-র দিকে উঁকি দিচ্ছে একটা পেরিস্কোপের মাথা। এটার সাহায্যেই মেশিনটাকে পানির নিচে চালানো হয়।

দু'ভাঁজ করা কি যেন একটা জিনিস জড়ানো আছে মেশিনের গায়ে। কোন কোন ডাচ বোটে এ ধরনের গ্যাংওয়ে দেখা যায়। বুঝলাম না, এটার কি ব্যবহার।

বো-তে দেখলাম তিন নম্বর হ্যাচওয়ে। এটার নিচে বোধহয় ওই লোক দুটোর কেবিন আছে।

একই রকম আরেকটা হ্যাচ দেখলাম স্টার্নে। এরই নিচে বোধহয় ক্যাপ্টেনের কেবিন। এখনও দেখাই হলো না তার সাথে। প্রতিটা হ্যাচ বিশেষ এক ধরনের রবার দিয়ে মোড়া। এতে পানির নিচে ডুব দিলে এক বিন্দু পানিও ঢুকবে না।

যে মোটরের শক্তিতে মেশিনটা এত জোরে ছুটতে পারছে, সেটাকে দেখলাম না কোথাও। কোন প্রপেলারও চোখে পড়ল না।

বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলেছে টেরর। পেছনে রেখে যাচ্ছে দীর্ঘ, মসৃণ, ফেনিল জলরেখা। মেশিনটা এত চমৎকারভাবে তৈরি, কোন ঢেউ উঠছে না বললেই চলে। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগরের বিশাল ঢেউয়ের মাথার ওপর দিয়েও এটা অনায়াসেই চলে যেতে পারবে।

এটা বাষ্প বা পেট্রোল চালিত নয় তা আমার জানা আছে। মোটরগাড়ি বা সাবমেরিনে যে রকম তেলের গন্ধ পাওয়া যায়, সে রকম কোন গন্ধ পাচ্ছি না। এটা তাহলে নিশ্চয় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎচালিত। কিন্তু এই বিদ্যুৎ আসছে কোত্থেকে? ব্যাটারি, নাকি অ্যাকুমুলেটর থেকে? অথবা অজ্ঞাত কোন প্রণালীতে বায়ুমণ্ডল বা পানি থেকেই তৈরি করা হচ্ছে বিদ্যুৎ? কোনদিন কি এই রহস্যের সমাধান খুঁজে পাব?

আবার মনে পড়ল ব্ল্যাক রক ক্রীকে ছেড়ে আসা সঙ্গীদের কথা। একজন আহত হয়েছিল। জানি না, অন্য দু'জনও হয়েছে কিনা। আমাকে রশিতে জড়িয়ে পড়তে দেখেছে ওরা। টেররে তুলে নিয়ে আমাকে জামাই আদর করা হবে না, এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি ওদের আছে। সুতরাং ওদের কাছে যে আমি মৃত তাতে কোন সন্দেহ নেই। টলেডো থেকে এতক্ষণে নিশ্চয় টেলিগ্রাম চলে গেছে মি. ওয়ার্ডের কাছে। এই সংবাদ পেয়ে কে আর লাগবে মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ডের পেছনে?

ক্যাপ্টেনের প্রতীক্ষায় ডেকে দাঁড়িয়ে এইসব চিন্তা-ভাবনাই মাথা জুড়ে রইল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকাই সার হলো। এলেন না ক্যাপ্টেন।

একটু পরেই খিদেয় পেট জ্বলে উঠল। গত চব্বিশ ঘণ্টা পেটে কিছু পড়েনি। সেই গতকাল বনে বসে তাড়াহুড়ো করে কিছু খেয়েছিলাম। পেটে এমন যন্ত্রণা শুরু হলো যে, ভাবলাম, টেররে আসার পর দু'দিন কি তারও বেশি কেটে গেল কিনা। ফিরলাম কেবিনে।

চুপচাপ ভাবছি ওরা আমাকে খেতে দেবে কিনা, এমন সময় বো-তে দাঁড়ানো লোকটা নিচে নেমে গেল। ফিরে এল আবার। টুঁ শব্দ না করে আমার সামনে নামিয়ে রাখল কিছু খাবার। তারপর আবার ফিরে গেল নিজের জায়গায়। টিনের মাংস, সী বিস্কিট আর একপাত্র এল্। গোগ্রাসে গিললাম। এল্টা এত কড়া, পানি মিশিয়ে খেতে হলো। খেয়ে-দেয়ে আবার কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম। ওই দু'জন নিশ্চয় খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলেছে আমার আগেই। এবারও আমাকে দেখে একটা কথা বলল না ওরা।

আবার ডুবে গেলাম চিন্তায়। কবে শেষ হবে এই অভিযান? ক্যাপ্টেনকে কি

শেষ পর্যন্ত দেখতে পাব? তিনি কি আমাকে ছেড়ে দেবেন? নাকি নিজেই সে ব্যবস্থা করতে পারব? সবকিছু নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর। কিন্তু টেরর যদি তীর থেকে বহুদূরে অথবা পানির নিচে থাকে তাহলে পালাব কি করে? না। ওটা ডাঙায় উঠে মোটরে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। তখন পেয়েও যেতে পারি কোন সুযোগ।

সবচেয়ে বড় কথা, আজগুবি চিন্তা করে লাভ কি? পালাবার সুযোগ পেলেও তো আমি পালাব না। টেররের গুপ্তরহস্য না জেনে পালিয়ে যাওয়া কি সম্ভব আমার পক্ষে? এখন পর্যন্ত আমার অভিযান সফল হয়নি। বেঘোরে প্রাণটা যেতে বসেছিল। আগামীতে হয়তো আরও দুর্ভোগ কপালে আছে। তবু, একদিক দিয়ে বিচার করলে অন্তত একটা ধাপ এগিয়েছি। টেররের ভেতরে তো ঢুকেছি। কিন্তু পৃথিবীর সাথে আবার যোগাযোগ হবে কি কখনও? মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড স্বেচ্ছায় আউট-ল হয়েছেন। আমিও তো বর্তমানে মানুষের আওতার বাইরে। তাহলে টেররে উঠেই বা কি লাভ হলো?

এখনও উত্তর-পুবেই চলেছে টেরর। লম্বালম্বিভাবে পার হচ্ছে লেক ইরি। অর্ধেক বেগে ছুটছে। নইলে কয়েক ঘণ্টা আগেই পৌঁছে যেত লেকের উত্তর-পুব প্রান্তে।

এদিকেই আছে নায়াগ্রা নদী। নায়াগ্রা আবার গিয়ে পড়েছে লেক ওন্টারিওতে। মাঝখানে সেই বিশ্ববিখ্যাত জলপ্রপাত। বাফেলো শহর থেকে মাইল পনেরো দূরে। টেরর এসেছিল ডেট্রয়েট নদী দিয়ে। যাচ্ছে নায়াগ্রা দিয়ে। কিন্তু এবারে যদি ডাঙায় না ওঠে তাহলে তো সোজা গিয়ে পড়বে জলপ্রপাতে।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। চমৎকার দিন। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। সূর্যের তাপে গায়ে জ্বালা ধরছে না। এখনও কোন তীর চোখে পড়ছে না। না কানাডা। না আমেরিকা।

ক্যাপ্টেন কি বাইরে আসবেন না? তাঁর লুকিয়ে থাকার কি অর্থ থাকতে পারে? তাহলে কি সন্ধ্যায় যখন তীর ছোঁবে টেরর, আমাকে নামিয়ে দেবেন ক্যাপ্টেন?

বেলা দুটোর দিকে খুট করে একটা শব্দ হলো। মাঝের হ্যাচটা ওপর দিকে উঠল। যাঁকে দেখার জন্যে অধীর হয়ে আছি, ডেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।

আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না। সোজা স্টার্নে গিয়ে হাল ধরলেন। লোকটা ছুটি পেয়ে তাঁর সাথে দু'একটা কথা বলল নিচু গলায়। তারপর সামনের হ্যাচওয়ে দিয়ে নেমে গেল নিচে। তীক্ষ্ণ চোখে দিগন্তের দিকে চেয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। কম্পাস দেখে সামান্য ঘুরিয়ে দিলেন টেররকে। গতি বেড়ে গেল।

এই সেই মানুষ যাঁকে দেখার জন্যে আমি এবং সারা পৃথিবীর লোক অধীর হয়ে আছে। পঞ্চাশের কিছু বেশি হবে বয়েস। মাঝারি উচ্চতা। শক্তিশালী সোজা কাঁধ। দৃঢ় মাথায় ধূসর ঘন চুল। খাটো, কোঁকড়ানো দাড়ি। বিশাল বুক, লম্বাটে চোয়াল। কোঁচকানো ঘন ভ্রূ প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচায়ক। তামাটে চামড়ার নিচে টগবগ করে ফুটছে রক্ত। নিখুঁত স্বাস্থ্যের অধিকারী একজন লৌহমানব বলা চলে তাঁকে।

সাথের দু'জন লোকের মতই পরনে সামুদ্রিক পোশাক। তার ওপর অয়েলস্কিন কোট। মাথায় উলের টুপি। ইচ্ছে করলেই গোটা মাথা ঢেকে ফেলতে পারবেন এই

টুপিতে।

ক্যাপ্টেনকে এর আগেও দেখেছি আমি। লং স্ট্রীটে আমার বাড়ির সামনে যে দু'জন লোক দেখেছিলাম, ইনি তাদেরই একজন। আমি যদি তাঁকে চিনতে পারি, তিনিও নিশ্চয় আমাকে চিনেছেন। বুঝতে পেরেছেন, গ্রেট আইরীর রহস্য ভেদ করার জন্যে যে লোকটি ছুটে গিয়েছিল, আমি সেই লোক। চীফ ইন্সপেক্টর স্ট্রক।

কৌতূহলী চোখে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। ফিরেও তাকালেন না তিনি। ভাবখানা এমন, নতুন একটা লোক যে আছে ডেকে তার কিছুই জানেন না।

চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হলো, তাঁকে আগেও যেন কোথায় দেখেছি। কিন্তু ওয়াশিংটনে প্রথম দেখে তো এ কথা মনে হয়নি। পুলিস দপ্তরে কি এঁর ছবি দেখেছি? নাকি কোন দোকানে? মনে করতে পারলাম না। হয়তো সবটাই আমার মনের ভুল।

যাই হোক, সাথের লোক দু'জন অভদ্র হলেও ইনি হয়তো আমার কথার জবাব দেবেন। তাঁরও ভাষা ইংরেজি। তবে আমেরিকান কিনা তা ঠিক বলতে পারব না। তিনি আমাকে না চেনার ভান করছেন। আমি তাঁর বন্দী। আমার সাথে কথা বলতে চান না?

তাহলে কি করতে চান আমাকে নিয়ে? শেষ করে দিতে চান? রাত নামলেই খতম করে ফেলে দেবেন পানিতে? আমি যেটুকু জেনেছি সেটুকুই তাঁর বিপদ ঘনিয়ে আনতে পারে, তাই কি এরকম চিন্তা করছেন? কিন্তু আমি তো নোঙরে প্যাঁচ লেগে এমনিতেই মারা যাচ্ছিলাম। মেরে ফেলার ইচ্ছে থাকলে আবার তুলে আনলেন কেন?

ঘুরে সোজা রওনা দিলাম স্টার্নের দিকে। একদম মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম। একটু পর তাকালেন আমার দিকে। গনগনে কয়লার মত জ্বলছে চোখ।

'আপনিই ক্যাপ্টেন?'

তিনি নিশ্চুপ।

'এই জাহাজ, এটাই কি টেরর?'

এবারও চুপ। আরেকটু এগোলাম। হাত ধরতে যেতেই এমন একটা ভঙ্গি করলেন, থেমে গেলাম আমি। ওই শরীরের ভেতর শক্তি ফুঁসছে।

আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে। গলা চড়িয়ে বললাম, 'কি করতে চান আমাকে নিয়ে?'

ঠোঁট কেঁপে উঠল ক্যাপ্টেনের। মনে হলো, এবার কথা বলবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিলেন। স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন মুখে। কথা এড়ানোর জন্যেই যেন মাথা ঘুরিয়ে নিলেন একপাশে। রেগুলেটরের মত একটা যন্ত্রে হাত দিলেন। সাথে সাথে গতি আরও বেড়ে গেল টেররের।

রাগে গা কাঁপতে লাগল আমার। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে উঠি, 'কথা বলবেন না? চুপ করে থাকবেন? থাকুন। তবে আমি জানি, আপনি কে। আপনার মেশিনও চিনি আমি। ম্যাডিসন, বোস্টন, লেক কারডালে এটাকেই দেখা গিয়েছিল। আপনিই বেপরোয়া মোটর চালিয়েছেন রাস্তায়। সাগরে চালিয়েছিলেন জাহাজ। আর লেকে সাবমেরিন! এটার নামই টেরর। আপনি তার কমাণ্ডার। আপনিই চিঠি

লিখে হুমকি দিয়েছিলেন সরকারকে। ভেবেছেন, সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। তাই নাম নিয়েছেন মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড! কিন্তু জেনে রাখুন, আপনি হেরে যাবেন সে লড়াইয়ে।'

আমি এসব বললে তিনি অস্বীকার করতে পারতেন না। কারণ হালের ওপর চোখ পড়েছিল আমার। স্পষ্ট খোদাই করা আছে সেই তিনটে বিখ্যাত অক্ষর এম. ও. ড্ব্লু.।

কোনমতে সামলে নিলাম নিজেকে। উত্তর পাব না ভেবে হতাশ হলাম। ফিরে গিয়ে ধপাস করে বসে পড়লাম আমার কেবিনের হ্যাচওয়ের কাছে।

অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলাম দিগন্তের দিকে। মনে আশা, তীর দেখব। তাই বসে বসে 'অপেক্ষা' করতে লাগলাম। হ্যাঁ, অপেক্ষা। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায়ই বা কি আমার! উত্তর-পুবেই ছুটে চলেছে টেরর। সন্ধ্যার আগে নিশ্চয় এটা পৌঁছে যাবে লেক ইরির শেষ সীমায়।

চোদ্দ

ঘণ্টার পর ঘণ্টা একইভাবে কেটে গেল। চালক লোকটা আবার ফিরে এসেছে ডেকে। ক্যাপ্টেন নিচে নেমে গিয়েছেন এঞ্জিন ঠিকমত চলছে কিনা দেখার জন্যে। গতি বাড়লেও এঞ্জিনের শব্দ বাড়েনি। চলছে একই মসৃণ ছন্দে। অধিকাংশ মোটরের পিস্টনই মাঝে মাঝে স্ট্রোক মিস করে। কিন্তু টেররের এঞ্জিন চলছে একইভাবে। এটা এক মেশিন থেকে আরেক মেশিনে রূপান্তরিত হয় সম্ভবত বোটারি এঞ্জিনের বদৌলতে। তবে আমার এই ধারণার পক্ষে অকাট্য কোন প্রমাণ এখনও পাইনি।

এখনও উত্তর-পুবে অর্থাৎ বাফেলোর দিকে এগিয়ে চলেছে টেরর।

ক্যাপ্টেন কেন গতিপথ পরিবর্তন করছেন না, বুঝলাম না। রকমারি নৌকো আর জাহাজে বাফেলোর তীর ছেয়ে আছে। ওখানে গিয়ে নিশ্চয় ঢুকে পড়বেন না। জলপথেই যদি এ লেক ছেড়ে যেতে চান তাহলে নায়াগ্রা নদী দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু টেরর যত শক্তিশালী মেশিনই হোক, নায়াগ্রা জলপ্রপাত অতিক্রম করা তার সাধ্যের বাইরে। ডেট্রয়েট নদী দিয়ে পালানোর একটা পথ ছিল। কিন্তু সেটা তো ক্রমেই পেছনে পড়ে যাচ্ছে।

আরেকটা চিন্তা মাথায় এল। রাত নামলে ক্যাপ্টেন হয়তো চুপি চুপি এটাকে ভিড়াবেন লেকের পাড়ে। তারপর মোটরগাড়ি বানিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর ভেতর দিয়ে সোজা চম্পট। মেশিনটা মাটির ওপরে থাকতে থাকতেই যদি পালাতে না পারি, তাহলে চিরতরে ওই আশা বাদ দিতে হবে।

লেক ইরির উত্তর-পুবের অ্যালবানি থেকে বাফেলো পর্যন্ত সমস্ত এলাকা আমি ভালভাবেই চিনি। বেশ কয়েকবার আমাকে আসতে হয়েছে এখানে। বছর তিনেক আগে একটা মিশন নিয়ে এসেছিলাম। সেবার নায়াগ্রার দুই তীর, জলপ্রপাতের

ওপরে নিচে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। ঝুলন্ত সেতুটাও বাদ যায়নি। বাফেলো আর নায়াগ্রা জলপ্রপাতের মাঝের গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ দুটোও দেখে গেছি। নেভি আর গোট আইল্যান্ড। এই দ্বীপ দুটো কানাডা আর আমেরিকার প্রপাতকে বিভক্ত করেছে।

অঞ্চলটা চেনা। পালালে অসুবিধেয় পড়ব না। কিন্তু পালানোর সুযোগ কি পাব? বুঝতে পারছি না, আমি আদৌ পালাতে চাই কিনা। জানি না, এখানে থাকলেই বা ভাগ্য কি বয়ে আনবে। সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য।

তাছাড়া নায়াগ্রা নদীর তীরে পৌঁছতে পারব, তারই বা নিশ্চয়তা কি? জেনে শুনে নিশ্চয় এই ফাঁদে পা দেবে না টেরর। লেকের শেষ পর্যন্তও বোধহয় যাবে না।

উত্তেজিত মগজের মধ্যে বন বন করে ঘুরতে লাগল এসব চিন্তা। চোখ কিন্তু চেয়েই রইল শূন্য দিগন্তে।

একটা কথা কিছুতেই মাথায় ঢুকল না। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কেন হুমকি দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন? ওয়াশিংটনে আমার ওপর নজরই বা কেন রেখেছিলেন? গ্রেট আইরীর সাথে তাঁর সম্পর্কটা কোথায়? ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের মাঝখান দিয়ে না হয় লেক কারডালে পৌঁছেছিলেন, কিন্তু দুর্ভেদ্য গ্রেট আইরীকেও কি তিনি ভেদ করে গিয়েছিলেন? না! সে ক্ষমতা তাঁর নেই!

বিকেল চারটে। টেররের গতিবেগের হিসেব কষে বুঝে নিলাম, বাফেলো আর বেশি দূরে নেই। মাইল পনেরো সামনে বাফেলোর আবছা আভাসও পেলাম। আসার পথে দু'চারটে নৌকো চোখে পড়ল। কিন্তু প্রতিবারই সেগুলোর অনেকখানি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। তাছাড়া, টেরর ছোটার সময় কোন ঢেউ ওঠে না। পানির ওপর এত সমান্তরাল ভাবে যায়, মাইল খানেক দূর থেকেও চোখে পড়া মুশকিল।

ধীরে ধীরে বাফেলোর ওপারে লেক ইরিকে ঘিরে থাকা পর্বতমালা চোখে পড়ল। প্রণালীটা দেখতে অনেকটা ফানেলের মত। এর ভেতর দিয়েই লেকের পানি গিয়ে পড়ছে নায়াগ্রা নদীতে। ডানদিকে কিছু ঝালিয়াড়ি ও গাছের জটলা। দূরে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা মালবাহী স্টীমার আর পালতোলা মাছ ধরা নৌকো। আকাশের গায়ে ধোঁয়ার সারি মুহূর্তে মিলিয়ে যাচ্ছে পুবালি বাতাসে।

ক্যাপ্টেনের ভাবসাব কিছু বুঝতে পারছি না। এখনও বাফেলোর দিকেই চলেছেন। ওদিকে আর এগোনো ঠিক হবে না এটা কি তাঁর বোঝা উচিত নয়? প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলাম, এই বুঝি হালের মোচড়ে মাথা ঘুরে যাবে। টেরর এগোবে পশ্চিম তীরের দিকে। অথবা ডুব দেবে পানির নিচে।

অবশেষে হালধারী লোকটা উত্তর-পুব তীর দেখতে দেখতে তার সাথীকে কি যেন একটা ইশারা করল। সাথে সাথে সে বো ছেড়ে মাঝের হ্যাচওয়ে দিয়ে নেমে গেল এঞ্জিন রুমে। ডেকে উঠে এলেন ক্যাপ্টেন। হালধারীর কাছে গিয়ে নিচু স্বরে কথা বলতে লাগলেন।

সে বাফেলোর দিকে হাত তুলে দেখাল। স্টারবোর্ডের পাঁচ-ছ'মাইল সামনে কালো দুটো ফুটকি চোখে পড়ল। ক্যাপ্টেন মনোযোগ দিয়ে সেটা দেখলেন। তারপর শ্রাগ করে বসে পড়লেন স্টার্নে। গতিপথ বদলালেন না।

পনেরো মিনিট পর বুঝলাম, ওই কালো ফুটকি দুটো আসলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কুণ্ডলী দুটো ক্রমেই বড় হচ্ছে। লম্বাটে, নিচু দুটো স্টীমার বাফেলো বন্দর ছেড়ে দ্রুতবেগে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

চকিতে মনে পড়ল, এ দুটো স্টীমার নয়। টর্পেডো ডেস্ট্রয়ার। এগুলোর কথাই বলেছিলেন মি. ওয়ার্ড।

দুটো ডেস্ট্রয়ারই অত্যাধুনিক। এগুলোই দেশের সর্বোচ্চ গতিবেগসম্পন্ন জলযান। ঘণ্টায় তিরিশ মাইল ছুটতে পারে। টেররের গতিবেগ অবশ্য আরও বেশি। তাছাড়া টেরর পানিতে ডুব দিলেই তো ওদের জারিজুরি শেষ। ওগুলো ডেস্ট্রয়ার না হয়ে সাবমেরিন হলে তবু কিছুটা টক্কর দিতে পারত। তবে সে অবস্থাতেও খুব একটা সুবিধে করতে পারত বলে মনে হয় না।

ডেস্ট্রয়ার দুটো সম্ভবত খবর পেয়েছে ওয়েলস মারফত। টলেডো ফিরেই তিনি টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন, হেরে গেছি আমরা। ফুল স্পীডে ছুটে আসছে ডেস্ট্রয়ার। সব দেখেও কোন পাত্তাই দিলেন না ক্যাপ্টেন। একইভাবে এগোতে লাগলেন নায়াগ্রার দিকে।

ওদের মতলবটা কি? সম্ভবত লেকের সরু মুখে গিয়ে বাধা দেবে। তাহলে নায়াগ্রা যাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে টেররের।

নিজের হাতে এবার হাল ধরলেন ক্যাপ্টেন। লোক দু'জনের একজন গিয়ে দাঁড়াল বো-তে। আরেকজন চলে গেল এঞ্জিন রুমে। আমাকে কি কেবিনে যেতে বলবেন?

আমার দিকে ফিরেও তাকাল না কেউ। আমি, একটা মানুষ যে ডেকে আছি, যেন জানেই না ওরা। চিন্তা ঝেড়ে ফেলে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম ডেস্ট্রয়ার দুটোকে। দূরত্ব যখন আর দু'মাইল, তখন দুটো সরে গেল দু'দিকে। দু'পাশ থেকেই এবার গোলা বর্ষণ করতে পারবে।

ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালাম। মুখে ভীষণ অবজ্ঞার ছাপ। ডেস্ট্রয়ার দুটো যে তাঁর কিছুই করতে পারবে না, এ ব্যাপারে যেন একেবারে নিশ্চিত। গতিবেগ বাড়ালেই ওই দুটোকে পেছনে ফেলে যেতে পারবেন। মেশিন সামান্য ঘুরিয়ে নিলেই চলে যাবেন কামানের আওতার বাইরে। আর ডুব দিলে তো কথাই নেই। কামানের গোলা কামানেই থাকবে।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল। আর মাত্র এক মাইল দূরে আছে ডেস্ট্রয়ার। ওদের আরও কাছে আসতে দিলেন ক্যাপ্টেন। তারপর চাপ দিলেন একটা হাতলে। দ্বিগুণ বেড়ে গেল প্রপেলারের শক্তি। লাফিয়ে সামনে এগুলো টেরর। ডেস্ট্রয়ারের সাথে খেলা করছেন ক্যাপ্টেন। ঘুরে পালিয়ে না গিয়ে সামনের দিকেই এগোচ্ছেন। ক্যাপ্টেনের যা ভাবসাব, বিদ্যুৎগতিতে ডেস্ট্রয়ার দুটোর মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। ভুলিয়ে ভালিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবেন। তারপর নামবে রাত। পিছু ছাড়তে বাধ্য হবে ডেস্ট্রয়ার।

লেকের প্রান্তে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বাফেলো শহর। বড় বড় বিল্ডিং, গির্জার চুড়ো, শস্য বয়ে নিয়ে যাওয়ার এলিভেটর সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর চার-পাঁচ মাইল সামনে গেলেই উত্তর দিকে পড়বে নায়াগ্রা নদী।

এরকম পরিস্থিতিতে আমার কি করা উচিত? ডেস্ট্রয়ারের সামনে বা মাঝখান দিয়ে যাবার সময় পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ব? আমি ভাল সাঁতারু। সুতরাং এই সুযোগ ছাড়া বোধহয় ঠিক হবে না। এখন ঝাঁপ দিলে আমার পিছু নেয়া সম্ভব নয় ক্যাপ্টেনের পক্ষে। হয়তো বুলেটের হাত থেকেও বেঁচে যাব। ডেস্ট্রয়ার দুটোর কোনটা না কোনটা দেখবেই আমাকে। হয়তো ইতোমধ্যেই আমাকে দেখে ফেলেছেন কমাণ্ডার। ঝাঁপ দিলেই একটা নৌকো পাঠিয়ে দেবেন আমাকে উদ্ধার করতে।

অবশ্য টেরর নায়াগ্রা নদীতে ঢুকলে আমার পালানোর সুযোগ আরও বাড়বে। নেভি আইল্যান্ডে একবার নেমে পড়তে পারলে আমাকে আর পায় কে। কিন্তু নদীতে পড়েই টেরর যদি ভেসে যায় জলপ্রপাতের তোড়ে? না। তা হতে পারে না। তার আগে কিছু একটা ব্যবস্থা করবেনই ক্যাপ্টেন। ডেস্ট্রয়ার দুটো আরও এগিয়ে আসুক। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।

পালাবার চিন্তা করছি বটে কিন্তু পালালেই তো রহস্য ভেদের সব সম্ভাবনা শেষ। আমার ভেতরের দায়িত্ববোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। একজন পুলিস কি কখনও কর্তব্য ছেড়ে পালাবার চিন্তা করতে পারে? এই আউট-ল-কে হাতের মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দেব? পালিয়ে সুগম করে দেব তাঁর পালাবার পথ? না। এটা অসম্ভব। কিন্তু ভাগ্যে কি আছে তা-ও তো বুঝতে পারছি না। ডেকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে শেষ পর্যন্ত টেরর কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে!

সোয়া ছ'টা বাজে। ডেস্ট্রয়ার দুটো ছুটে আসছে। গতিবেগে কাঁপছে থরথর করে। আর মাত্র বারো বা পনেরো কেবল লেংথের* ব্যবধান রয়েছে। গতিবেগ বাড়ল না টেররের। ডান ও বাঁ দিক ঘিরে এগিয়ে আসছে ডেস্ট্রয়ার।

আমি ওখান থেকে নড়লাম না। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বো-র লোকটা। হাল ধরে পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন। ভ্রূ কোঁচকানো, চোখ জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। যেন অপেক্ষা করছেন। শেষ মুহূর্তে দেখাবেন ওস্তাদের মার।

আচমকা বাঁ দিকের ডেস্ট্রয়ার থেকে সাঁই করে বেরিয়ে এল এক ঝাঁক ধোঁয়া। পানি ঘেঁষে এল গোলাটা। কিন্তু টেররকে আঘাত হানতে পারল না। পাশ দিয়ে বেরিয়ে ডানের ডেস্ট্রয়ারটাকে ছাড়িয়ে চলে গেল বহু দূরে।

উদ্বিগ্ন চোখে আশপাশে তাকালাম। বো-র লোকটা ক্যাপ্টেনের নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। একই রকম অবজ্ঞার ভাব ক্যাপ্টেনের মুখে। পাশ দিয়ে একটা গোলা বেরিয়ে গেল। অথচ ভ্রূক্ষেপই নেই। তাঁর ওই মুখ জীবনে ভুলব না।

এই সময় আমাকে হ্যাচওয়ে দিয়ে ঠেলে নামিয়ে দেয়া হলো কেবিনে। মাথার ওপর বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচ। বন্ধ হয়ে গেল অন্য দুটো হ্যাচও। এক ফোঁটা পানিও আর ঢুকবে না ডেকে। কলকব্জার একটা ধক ধক শব্দ কানে এল। লেকের গভীরে ডুব দিল সাবমেরিন।

ওপর দিয়ে গর্জন করে ছুটে গেল কামানের গোলা। গুম গুম করে প্রতিধ্বনি টের পেলাম পানির নিচে। তারপর সব নিস্তব্ধ। পোর্টহোল দিয়ে আবছা একটা আলো

---

* এক কেবল লেংথ=৬০০ ফুট।

আসছে কেবিনে। সামান্যতম দোলাও লাগছে না। সাবমেরিন নিঃশব্দে ছুটে চলেছে লেকের তল দিয়ে।

কত তাড়াতাড়ি, কত অবলীলায় এক মেশিন থেকে আরেক মেশিনে রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা রাখে টেরর সেটা নিজের চোখেই দেখলাম। নিশ্চয় এরকম দ্রুত আর অনায়াস ভঙ্গিতেই রূপান্তরিত হতে পারে মোটর গাড়িতে।

এবার কি করবেন ক্যাপ্টেন? মোটর হয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটতে না চাইলে নিশ্চয় গতিপথ পরিবর্তন করবেন। সম্ভবত ডেস্ট্রয়ার দুটোকে পেছনে ফেলে ছুটবেন পশ্চিম দিকে। গিয়ে পড়বেন ড্রেট্রয়েট নদীতে। তারপর হয় কামানের পাল্লার বাইরে গিয়ে, নয়তো রাত নামলে ভেসে উঠবেন আবার।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। মিনিট দশেক যেতে না যেতেই ডেকের ওপর একটা গোলমাল শুরু হলো। এঞ্জিন রুম থেকে ভেসে এল উত্তেজিত কথাবার্তা। এতক্ষণ মেশিন চলছিল মসৃণ গতিতে। হঠাৎ এঞ্জিনের শব্দ কর্কশ হয়ে উঠল। নিশ্চয় কোন গণ্ডগোল হয়েছে যন্ত্রপাতিতে। ওপরে ভেসে ওঠা ছাড়া উপায় নেই।

আমার ধারণা ঠিক। কেবিনের ঝাপসা আলো কেটে গিয়ে হেসে উঠল উজ্জ্বল সূর্যালোক। ভেসে উঠেছে টেরর। ডেকের ওপর হাঁটাচলার আওয়াজ পেলাম। খুলে দেয়া হলো হ্যাচগুলো। আমারটা খুলতেই মই বেয়ে লাফিয়ে উঠলাম ডেকে।

আবার হাল ধরেছেন ক্যাপ্টেন। অন্য দু'জন নিচে ব্যস্ত। ডেস্ট্রয়ার দুটো গেছে কি যায়নি ভেবে পিছনে চোখ মেলতেই চমকে উঠলাম। যায়নি! মাত্র সিকি মাইল দূরে! টেররকে ইতোমধ্যেই দেখতে পেয়েছে ওরা। পিছু ধাওয়া শুরু করেছে সাথে সাথে। টেরর ছুটে চলল নায়াগ্রা নদীর দিকে।

ক্যাপ্টেনের প্ল্যান সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণাও করতে পারলাম না। ডুব দিল। কিন্তু এঞ্জিনের গোলমালে ভেসে উঠল আবার। এখন ঘুরে পালানোর চেষ্টা করেও লাভ নেই। রাস্তা বন্ধ করে এগিয়ে আসছে ডেস্ট্রয়ার। তাহলে কি ডাঙায় উঠে মোটরগাড়ি হয়ে কেটে পড়ার ইচ্ছে? কিন্তু তার আগেই তো প্রত্যেকটা পুলিস স্টেশনে টেলিগ্রাম পৌঁছে যাবে। সারা রাস্তায় তৈরি হয়ে থাকবে ওরা।

আধ মাইলও এগিয়ে নেই আমরা। পূর্ণ বেগে ছুটে আসছে ডেস্ট্রয়ার। অবশ্য একদম পেছনে থাকায় কামান চালানোর অসুবিধে আছে। ক্যাপ্টেন মনে হলো এই ব্যবধানটুকু রাখতে পারলেই খুশি। তিনি ইচ্ছে করলেই অবশ্য ব্যবধান বাড়িয়ে ফেলতে পারেন। তারপর রাত নামলে গোঁত্তা মেরে ডেস্ট্রয়ারের পেছন দিক দিয়ে সরে পড়া।

ডানপাশের বাফেলো ইতোমধ্যেই মিলিয়ে গেছে দৃষ্টিসীমা থেকে। সাতটার কিছু পরে সামনে দেখা গেল নায়াগ্রা নদীর প্রবেশ মুখ। ওখানে ঢুকলে আর ফিরে আসার পথ নেই। ক্যাপ্টেন কি পাগল হয়ে গেলেন! অবশ্য একদিক দিয়ে তিনি তো পাগলই। পাগল না হলে নিজেকে কেউ মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড বলে? বিশ্বাস করে নিজেকে পৃথিবীর সম্রাট বলে?

তাঁকে দেখে অবাক হলাম। শান্ত মুখ। পেছনে ডেস্ট্রয়ার ছুটে আসছে জেনেও বিন্দুমাত্র বিচলিত নন।

লেকের এই প্রান্ত একেবারে ফাঁকা। এদিকে জাহাজ চালানো বিপজ্জনক বলে মালবাহী স্টীমারগুলোও খুব কম আসে। এখন তো একটাও নেই। একটা মাছ ধরা নৌকো পর্যন্ত চোখে পড়ল না। পাগলের মত এভাবেই যদি এগিয়ে চলি আমরা, এমনকি ডেস্ট্রয়ার দুটো পর্যন্ত ফিরে যেতে বাধ্য হবে।

নায়াগ্রা নদী প্রায় এক মাইল চওড়া। প্রপাতের দিকে যতই এগিয়েছে ততই সরু হয়ে এসেছে। লেক ইরি থেকে লেক ওন্টারিও পর্যন্ত এটা লম্বায় প্রায় পনেরো লীগ*। নদীটা বয়ে চলেছে উত্তরদিকে। বিশাল এই হ্রদমালার লেক সুপিরিয়র, মিশিগান, হুরন, ইরি হয়ে পানি গিয়ে পড়ছে পশ্চিমের লেক ওন্টারিওতে। নদীর ঠিক মাঝখানেই বিশ্ববিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাত। উচ্চতা দেড়শো ফুট। এটাকে 'হর্স শু ফলস'ও বলা হয়। কারণ, জলপ্রপাতটা ভেতরদিকে ঘোড়ার নালের মত বেঁকে গেছে। রেড ইন্ডিয়ানরা এটার নাম দিয়েছে—থান্ডার অভ ওয়াটার্স। জলবজ্র। নামটা যথার্থ। বিরামহীন গর্জন করে আছড়ে পড়ছে পানি দেড়শো ফুট উপর থেকে। বজ্রপাতের মত এই শব্দ বেশ কয়েক মাইল দূর থেকে শোনা যায়।

লেক ইরি আর নায়াগ্রার ক্ষুদ্র শহরের মাঝামাঝি দুটো দ্বীপ জলধারাকে বিভক্ত করেছে। জলপ্রপাতের এক লীগ ওপরে নেভি আইল্যান্ড। আর কানাডা ও আমেরিকার প্রপাতের মাঝখানে গোট আইল্যান্ড। এই দ্বীপের শেষ প্রান্তেই একসময় ছিল কারিগরের অসম্ভব সাহসিক কীর্তি—টেরাপিন টাওয়ার। টাওয়ার ছিল খাদের একদম কিনারায়। প্রপাতের ঠিক মাঝখানে। কিন্তু প্রপাতের তলদেশের পাথর ক্রমাগত ক্ষয়ে যাবার ফলে টাওয়ারের পাথরের ভিত সরতে সরতে চলে গেছে খাদের দিকে। তারপর একদিন ধসে পড়ে বিলীন হয়ে গেছে চিরকালের মত।

নদীর প্রবেশ মুখেই কানাডার উপকূলে ফোর্ট ইরি শহর। প্রপাতের তীর বরাবর, নেভি আইল্যান্ডের দু'পাশে আছে আরও দুটো শহর। বামদিকে চিপ্পেওয়া। ডানদিকে স্লপার। এই প্রণালীতে জলধারা সরু হয়ে এসে বয়ে গেছে প্রচণ্ড বেগে। সোজা গিয়ে পড়েছে দু'মাইল সামনের জলপ্রপাতে।

টেরর ইতোমধ্যেই ফোর্ট ইরি পেরিয়ে এসেছে। পশ্চিমে সূর্য হেলান দিয়েছে কানাডার দিগন্তে। দক্ষিণের কুয়াশার ওপর দিয়ে ফুটে উঠেছে চাঁদের আধো আলো। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই নেমে আসবে নিকষ কালো অন্ধকার।

মাইলখানেক পেছনে তেড়ে আসছে ডেস্ট্রয়ার দুটো। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে ভক ভক করে। দু'পাশের তীরে সবুজ গাছপালা আর মনোরম বাগান ঘেরা ছড়ানো ছিটানো কুটির।

ইচ্ছে করলেও এখন আর পেছনে ফিরতে পারবে না টেরর। সরু পথ জুড়ে ছুটে আসছে ডেস্ট্রয়ার। ওদের কমান্ডার অবশ্য জানেন না, কল নষ্ট হয়েছে এটার। সাবমেরিন হয়ে ডুব দিয়ে আর পালাতে পারবে না। ছুটে আসছেই ডেস্ট্রয়ার। হেস্ত-নেস্ত একটা না করে ছাড়বে না যেন।

বিপজ্জনক এই জলরাশি ভেদ করে ওদের ছুটে আসা দেখে চমৎকৃত না হয়ে পারলাম না। তার চেয়েও বেশি চমৎকৃত হলাম ক্যাপ্টেনের ভাবসাব দেখে। আর

---

* এক লীগ=প্রায় সাড়ে তিন মাইল।

মাত্র আধ ঘণ্টা ছুটলেই এসে পড়বে জলপ্রপাত। যত শক্তিই থাক এই মেশিনের, প্রপাতের সাথে লড়াই করে টিকে থাকার ক্ষমতা নিশ্চয় নেই। স্রোতের টানে একবার গিয়ে পড়লে আর রক্ষা নেই। দুশো ফুট নিচের গর্তে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে চিরতরে। তবে, ক্যাপ্টেন বোধ হয় অন্য কথা ভাবছেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘুরে হয়তো উঠে পড়বেন কোন তীরে। তারপর হাওয়া হয়ে যাবেন মোটরগাড়ি হয়ে।

উত্তেজনায় গা কাঁপছে আমার। কি করব এখন? নেভি আইল্যান্ড পর্যন্ত গেলে ঝাঁপ দিয়ে কূলে ওঠার চেষ্টা করব? এবার সুযোগ না নিলে হয়তো আর সুযোগ পাব না। অনেক গোপন তথ্য ইতোমধ্যেই জেনে ফেলেছি। মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড আর কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না আমাকে।

তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে, পালানোর উপায়ই বোধহয় আর নেই। কেবিনে বন্ধ করে না রাখলেও আমার ওপর নজর ঠিকই রাখা হচ্ছে। ক্যাপ্টেন হাল ধরে বসে আছেন। কিন্তু তাঁর সহকারী এক মুহূর্তের জন্যেও আমার ওপর থেকে চোখ সরায়নি। পালাবার চেষ্টা করলেই আমাকে ধরে ফেলবে। কেবিনে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে রাখবে। টেররের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছি আমি। এটার ভাগ্যে যা ঘটবে ওই একই পরিণতি হবে আমারও।

ডেস্ট্রয়ারের সাথে আমাদের ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে। দেখতে দেখতে মাত্র কয়েক কেবল লেংথের মধ্যে এসে পড়ল ওরা। পানির তলে কল বিগড়ানোর পর টেরর কি তার গতি বাড়াতে পারছে না? এখনও উদ্বেগের কোন ছাপ নেই ক্যাপ্টেনের মুখে। ডাঙায় ওঠার কোন ইচ্ছে আছে বলেও তো মনে হচ্ছে না।

ডেস্ট্রয়ারের ভালভ থেকে বাষ্প বেরোনোর হিস হিস শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এখন। তার চেয়ে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি জলপ্রপাতের গর্জন। আর তিন মাইল দূরেও নেই!

নদীর বাঁ শাখা ধরে নেভি আইল্যান্ডকে পাশ কাটিয়ে গেল টেরর। ইচ্ছে করলে অনায়াসেই উঠে পড়তে পারত তীরে। উঠল না। পাঁচ মিনিট পরেই গোট আইল্যান্ডের গাছপালা চোখে পড়ল। স্রোত ক্রমেই দুর্বার হয়ে উঠছে। টেরর না থামলেও ডেস্ট্রয়ারকে এবার থামতেই হবে। মহানন্দে জলপ্রপাতে ঝাঁপ দিতে পারেন এই অভিশপ্ত ক্যাপ্টেন। কিন্তু পেছনের ওদের নিশ্চয় সে রকম খায়েশ নেই!

সত্যিই দুই কমান্ডার পরস্পর ইশারা করলেন। থেমে গেল ডেস্ট্রয়ার। আর মাত্র ছ'শো ফুট সামনেই জলপ্রপাত। একের পর এক কামান দাগতে লাগলেন ওঁরা। শোঁ শোঁ করে গোলা উড়ে গেল টেররের উপর দিয়ে। গড়নে নিচু হওয়ায় লাগল না একটাও।

সূর্য ডুবে গেছে। গোধূলির ফাঁক দিয়ে দক্ষিণে দেখা যাচ্ছে চাঁদের রশ্মি। স্রোতের টানে গতি দ্বিগুণ হয়ে গেছে। বুলেটের মত ছুটে চলেছে টেরর। আর কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব প্রকাণ্ড গহ্বরে।

মহা আতঙ্কে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল আমার। সাঁৎ করে পাশ কেটে গেল গোট আইল্যান্ডের তীর। এল থ্রী সিস্টার্স আইল্যান্ড। ঝুর ঝুর করে প্রপাতের পানির কণা ঝরে পড়ছে এই দ্বীপের ওপর।

লাফ দিলাম আমি। বাঁচার সম্ভাবনা নেই, জানি। তবু এটাই আমার সর্বশেষ সুযোগ। পানিতে পড়ব, এমন সময় একজন জাপটে ধরল পেছনদিক থেকে।

ধক ধক করে কলকব্জা চলছিল এতক্ষণ। হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সে আওয়াজ। টেররের দু'পাশে ভাঁজ করে রাখা গ্যাংওয়ে দুটো খুলে গেল পাখির ডানার মত।

প্রপাতের একেবারে কিনারায় পৌঁছে গেছে, কানে তালা লেগে যাচ্ছে ভয়াবহ গর্জনে, ঠিক এইসময় মৃদু একটা ঝাঁকি দিয়ে শূন্যে উঠে পড়ল টেরর। রামধনুর মত বাঁকা চন্দ্রালোকের মাঝখান দিয়ে উড়ে গেল আকাশে।

পনেরো

গভীর ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে। মনে হলো, মেশিনটা স্থির হয়ে আছে। রাস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছে না। পানির ওপর বা নিচ দিয়েও ছুটছে না। উড়ছে না আকাশেও। তাহলে কি পৌঁছে গেছি রহস্যময় সেই গোপন ঘাঁটিতে, আজ পর্যন্ত যেখানে পা পড়েনি কোন মানুষের?

এত গভীর ঘুম ঘুমিয়েছি, অবাকই হলাম একটু। আকাশে ওড়ার কিছুই প্রায় দেখতে পাইনি। তাহলে কি আমার খাবারের সাথে ঘুমের ওষুধ মেশানো হয়েছিল, যাতে কোথায় নামছি সেটা জানতে না পারি? গতকালের কথা মনে হলো। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। জলপ্রপাতে আছড়ে পড়ার পরিবর্তে টেরর কিনা উড়ে উঠল আকাশে!

এতদিন ভাবতাম, মেশিনটা তিনভাবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু আসলে এটা ফোর-ইন-ওয়ান! একাধারে মোটরগাড়ি, জাহাজ, সাবমেরিন আর উড়োজাহাজ। জল-স্থল-আকাশ সর্বত্র অবাধ গতি এই মেশিনের! তার ওপর এই অবিশ্বাস্য গতি। দেখলাম একই এঞ্জিন এটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে জলে-স্থলে-আকাশে। অনেক কিছু দেখেছি কিন্তু মূল রহস্যটা এখনও দেখিনি। বিস্ময়কর এই এঞ্জিনের শক্তির উৎস কোথায়? আর অনায়াসে, দম্ভ ভরে যিনি চালাচ্ছেন এই বিস্ময়কর মেশিন, ততোধিক বিস্ময়কর সেই আবিষ্কর্তাটির আসল পরিচয় কি?

নায়াগ্রার ওপর যখন উড়ে উঠল টেরর, কেবিনের হ্যাচওয়ের ওপর কাত হয়ে গেলাম আমি। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় স্পষ্ট বুঝলাম, কোনদিকে চলেছে এটা। নদীর ওপর দিয়ে উড়ছে। তিন মাইল দূরের ঝুলন্ত সেতুটা পেরিয়ে গেল। এখান থেকেই দুর্বার হয়ে উঠেছে নায়াগ্রার স্রোত। প্রবল বাঁক নিয়ে নেমে গেছে লেক ওন্টারিওর দিকে।

এখানে এসেই টেরর পুবদিকে বাঁক নিল। তখনও হাল ধরে আছেন ক্যাপ্টেন। আমি আর তাঁর সাথে কথা বলিনি। উত্তর যখন পাব না, বলে লাভ কি?

যে ক্ষমতা তার করায়ত্ত তাতে নিজেকে মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড ঘোষণা করলে দোষ দেয়া যায় না। মানুষের তৈরি তাবৎ মেশিনের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন তাঁর মেশিন। এই ক্ষমতার কাছে সাধারণ মানুষ একেবারে অসহায়। অসাধারণ এই

মেশিন কেন তিনি বিক্রি করবেন? লক্ষ কোটি ডলার এর তুলনায় তুচ্ছ। তাঁর চলনে-বলনে যে অনায়াসভাব, সেটা তাঁর আত্মবিশ্বাসেরই বহিঃপ্রকাশ। তবে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবে, কে জানে! পাগল না হয়ে যান শেষ পর্যন্ত!

ওড়ার আধ ঘন্টা পরেই ঢলে পড়লাম ঘুমে। তারপর টেরর কোন পথে গেছে, জানি না। আমাকে নিশ্চয় ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল। ক্যাপ্টেন আমাকে দেখাতে চাননি তাঁর যাত্রাপথ।

৩১ জুলাই রাতে বাকি পথটা উড়ে গিয়েছিল, নাকি আবার সাগর বা হ্রদে নেমেছিল, অথবা ছুটে গিয়েছিল আমেরিকার রাজপথ ধরে, জানি না। কিছুই জানি না।

এরপর কি ঘটবে? আমার কপালেই বা কি আছে?

আগেই বলেছি, ঘুম ভেঙেই মনে হলো এটা একেবারে স্থির হয়ে আছে। চললে সামান্য নড়াচড়ার আভাস তো পেতাম। চুপচাপ শুয়ে থাকলাম কেবিনে।

আমার এখন ডেকে গিয়ে দেখা দরকার, কোথায় নেমেছে মেশিনটা। হ্যাচ খোলার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

'আবার যাত্রা শুরু না করা পর্যন্ত এভাবে বন্দী হয়ে থাকতে হবে?' বিড়বিড় করে বললাম আমি। কিন্তু টেরর চলাকালীন তো পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠলাম। আরও কতক্ষণ বন্দী হয়ে থাকতে হবে!

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। মিনিট পনেরো পরেই খটাং করে হুড়কো খোলার শব্দ কানে এল। ওপর থেকে হ্যাচ টেনে তুলল কেউ। এক ঝলক আলো-বাতাস এসে ঢুকল কেবিনে।

এক লাফে ডেকের ওপর উঠে এলাম। মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিলাম চারপাশ।

যা ভেবেছি তাই। স্থির হয়ে আছে। পনেরো থেকে আঠারোশো ফুট বেড়ের বিশাল এক পাথুরে দেয়ালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে টেরর। পায়ের নিচে হলুদ নুড়ির কার্পেট বিছানো। লতাপাতার চিহ্নমাত্র নেই।

গহ্বরটা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ডিম্বাকৃতি। চারপাশ ঘেরা পাথুরে দেয়ালের উচ্চতা বা চুড়োর আকার সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে পারলাম না। মাথার ওপরের ঘন কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারছে না। বালুকাময় মেঝের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে মেঘের স্তর। এখন নিশ্চয় ভোর। আর কিছুক্ষণ পর কুয়াশা কেটে হেসে উঠবে সূর্যালোক।

আজ ১ আগস্ট। তবু বেশ শীত শীত করছে। আমরা বোধহয় উত্তরে বা সমুদ্র পৃষ্ঠের অনেক ওপরে রয়েছি। তবে আমেরিকা ছেড়ে যাইনি, এটাও ঠিক। কোন অঞ্চলে আছি সেটা আন্দাজ করা কঠিন। যত বেগেই উড়ে আসুক, নায়াগ্রা থেকে রওনা হবার পর বারো ঘন্টায় নিশ্চয় মহাসাগর পাড়ি দিতে পারেনি।

এই সময় পাথুরে দেয়ালের একটা সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। সুড়ঙ্গটা দেয়ালের পাদদেশে। মুখ ঘন কুয়াশায় ঢাকা। মাথার ওপর কুয়াশার চাদর ফুঁড়ে মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে বিশালকায় পাখির ছায়া। গাঢ় নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যাচ্ছে কর্কশ চিৎকারে। ডানাওয়ালা এই উড়ন্ত দানবকে দেখে হয়তো ভয় পেয়েছে ওরা। এটার সাথে শক্তি বা গতি কোনটাতেই তো পাল্লা দিতে পারবে না।

সব দেখে শুনে বিশ্বাস হলো, এটাই সেই গোপন ঘাঁটি। এখানেই তিনি বিশ্রাম নেন। এটাই তাঁর মোটরের গ্যারেজ, জাহাজের বন্দর আর উড়োজাহাজের হ্যাঙ্গার।

আমাকে বাধা দেয়ার কোন লক্ষণ দেখছি না ওদের মধ্যে। এই সুযোগে মেশিনটাকে একবার ভাল করে দেখা যায়। আগে আমাকে নজরবন্দী করে রাখলেও এখন কোন গুরুত্বই দিচ্ছেন না ক্যাপ্টেন। দুই সহকারীকে নিয়ে আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে উধাও হলেন তিনি। টেরবের বাইরেটা দেখে নেয়ার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। ভেতরটা হয়তো ভাল করে দেখতে পারব না।

আমার কেবিনেরটা ছাড়া অন্য হ্যাচগুলো বন্ধ। ওগুলোকে খোলার চেষ্টা করাও বৃথা। দেখি তো, কেমন করে ইচ্ছে মত রূপান্তরিত হতে পারে মেশিনটা। লাফিয়ে নামলাম মেঝেতে।

আগেই বলেছি, মেশিনটার গড়ন লম্বাটে ধরনের। স্টার্নের তুলনায় বো বেশি ছুঁচল। অ্যালুমিনিয়ামে মোড়া গা। পাখা দুটো কি ধাতুর বুঝতে পারলাম না। প্রায় দু'ফুট ব্যাসের চারটে চাকা। হাওয়া ভরা টায়ারগুলো এত পুরু যে যত জোরেই ছুটুক ঝাঁকুনি টের পাওয়া যায় না। স্পোকগুলো অনেকটা বৈঠা বা টেবিল টেনিস ব্যাটের মত। পানির ওপর বা নিচে চলার সময় এগুলোই নিশ্চয় গতি বাড়াতে সহায়তা করে।

চাকাগুলো অবশ্য প্রধান প্রপেলার নয়। কীলের দু'পাশে দুটো পারসনস্ টারবাইন বসানো আছে। এঞ্জিনের শক্তিতে প্রচণ্ড জোরে ঘুরতে থাকে দুই টারবাইন। পানিতে চালিত করে টেরবকে। এই দুটোই শূন্যে বাতাসও কাটে কিনা কে জানে।

বাতাসে ভাসতে সবচেয়ে সাহায্য করে অবশ্য ডানা দুটো। এখন দু'পাশে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে। বাতাসের চেয়ে ভারি মেশিনও যে আকাশে উড়তে পারে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন এই বিস্ময়কর আবিষ্কর্তা। শুধু ওড়েই না, পৃথিবীর বৃহত্তম পাখির চেয়েও দ্রুতগতিতে ওড়ে।

এবারও মনে হলো, এটার সমস্ত কলকব্জা বিদ্যুৎচালিত। কিন্তু ব্যাটারিগুলো বিদ্যুৎ পাচ্ছে কোন উৎস থেকে? অন্য কোথাও কি লুকানো কোন বৈদ্যুতিক কারখানা আছে, যেখানে গিয়ে তাঁকে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করতে হয়? নাকি ওই সুড়ঙ্গের ভেতরের কোন ডায়নামোতে তৈরি হয় বিদ্যুৎ?

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মেশিনটার আছে চাকা, টারবাইন আর ডানা। এঞ্জিন চলে কিসের শক্তিতে, তার কিছুই জানতে পারলাম না। আর গোপন তথ্য জেনেই বা কি লাভ? মুক্তি পেলে তবে না এই জানা কাজে লাগত।

পালানোর পথ নিশ্চয় আছে। কিন্তু লেকে অত সুযোগ পেয়েও পালাতে পারিনি, এই ঘাঁটি থেকে পালাব কি করে?

প্রথমে জানা দরকার, এই গর্তটা কোন অঞ্চলে। বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা কি। এখান থেকে উড়ে বের হওয়া ছাড়া আর কিছু বুদ্ধি নেই? আমেরিকার কোন অঞ্চলে আছি সেটা জানা খুব জরুরী। অন্ধকারের মধ্যে নিশ্চয় শত শত লীগ পেরিয়ে এসেছি।

একটা অনুমান করা যায়। অনুমানটা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও বিবেচনা করতে দোষ নেই। টেবরের মত একটা মেশিনের পক্ষে সবচেয়ে ভাল ঘাঁটি একটাই আছে। গ্রেট আইরী। উড়ে এটার চূড়োয় ওঠা কি ক্যাপ্টেনের পক্ষে খুব কঠিন? শকুন আর ঈগলেরা যেখানে উড়ে আসতে পারে, সেখানে তিনি পারবেন না কেন? পুলিস বা আর কোন মানুষই যেখানে আসতে পারে না, মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ডের পক্ষে সেখানে ঘাঁটি গাড়াই তো সবচেয়ে নিরাপদ। সবচেয়ে বড় কথা, নায়াগ্রা থেকে ব্লুরিজ পর্বতমালার দূরত্ব সাড়ে চারশো মাইলের বেশি হবে না। এই দূরত্ব অতিক্রম করা টেররের কাছে কিছুই নয়।

অনুমানটা ধীরে ধীরে বিশ্বাসে পরিণত হলো। আমাকে লেখা সেই চিঠিটার সাথে গ্রেট আইরীর যোগাযোগ তো এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। হুমকি দেয়া হয়েছিল, এই পাহাড়ে আবার ওঠার চেষ্টা করলে আমার প্রাণনাশের সম্ভাবনা আছে। পেছনে লোক কেন লেগেছিল, গ্রেট আইরী নিয়ে অত হৈ চৈ কেন হয়েছিল, সব এবার দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর কোন সন্দেহ নেই। এটা গ্রেট আইরী! গ্রেট আইরীতেই নেমেছি আমরা।

এখানে ঢোকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। বেরোতে গেলেও কি সেই একই ফল হবে না? টেররে করে ছাড়া এখান থেকে বেরোনো বোধহয় সম্ভব হবে না। আহ্! এখনি সরে যাক কুয়াশার জাল। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, যা ভেবেছি তা সত্যি কিনা।

এবার গর্তটা ঘুরে দেখা যাক। ক্যাপ্টেন তাঁর দুই সহকারীসহ ঢুকেছেন উত্তর দিকের সুড়ঙ্গে। সুতরাং আমি দেখব দক্ষিণ দিকটা।

পাথুরে দেয়ালের পাদদেশে পৌঁছে ওটার গা বরাবর হাঁটতে লাগলাম। দেয়ালের অনেক জায়গা ভেঙে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। অ্যালুমিনিয়াম পটাশিয়াম আর সোডিয়াম সমৃদ্ধ ফেলডস্পার পাথর চোখে পড়ল। অ্যালেঘানি অঞ্চলে এই জাতের পাথরই বেশি। কিন্তু এই দেয়ালের উচ্চতা কতখানি বা চূড়োটা কেমন, এখনও দেখতে পাচ্ছি না। কুয়াশা ফুঁড়ে সূর্যের আলো না আসা পর্যন্ত দেখতে পাওয়ার কোন সম্ভাবনাও নেই।

এই ফাঁকে আরও কিছুটা ঘুরে দেখা যাক। ফাটল অনেক থাকলেও কোনটাই গভীর নয়। ফাটলগুলো মানুষের জমানো আবর্জনায় ভর্তি। কোনটায় শুকনো কাঠ। আবার কোনটায় শুকনো ঘাস। বালির ওপর মানুষের পায়ের ছাপ। নিশ্চয় ক্যাপ্টেন আর তাঁর সঙ্গীদের। ছাপগুলো সম্ভবত কয়েক মাসের পুরানো।

ওঁরা এতক্ষণ সুড়ঙ্গেই ব্যস্ত ছিলেন। এবার বেরোলেন বেশ কিছু বড় বড় বান্ডিলসহ। এগুলো কি টেরবে তোলা হবে? আর এইরকম বান্ডিল বাঁধার মানে কি? চিরদিনের মত ছেড়ে যাবেন এই ঘাঁটি?

আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হলো আমার অনুসন্ধান। ফিরে এলাম গর্তের মাঝখানে। এখানে সেখানে স্তূপীকৃত ছাই। পোড়া কাঠের টুকরো, কড়িকাঠ। মরচে ধরা লোহা লাগানো আছে কাঠের খুঁটিতে। আগুনে পুড়ে দুমড়ে-মুচকে আছে ধাতুর বর্ম। জটিল কিছু যন্ত্রপাতির অবশিষ্টাংশ—সব ধ্বংস হয়ে গেছে আগুনে।

অল্প কিছুদিন আগে এখানে বোধহয় প্রচণ্ড একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে। তবে

সেটা ইচ্ছে করে লাগানো হয়েছিল নাকি দুর্ঘটনা, বুঝতে পারছি না। এই আগুনই সম্ভবত দেখা গিয়েছিল গ্রেট আইরীর চুড়োয়। লাল হয়ে গিয়েছিল আকাশ। আর তাই দেখে ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিল প্লেজ্যান্ট গার্ডেন আর মরগ্যানটনের অধিবাসীরা। কিন্তু এইসব টুকরো যন্ত্রপাতি কিসের? ক্যাপ্টেন সেগুলো পুড়িয়ে ছাই-ই বা করলেন কেন?

এইসময় পুবদিক থেকে বয়ে গেল ঝিরঝিরে বাতাস। দেখতে দেখতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। গর্তের ভেতরটা ঝলমল করে উঠল সূর্যের আলোয়।

ওপর দিকে চেয়েই চিৎকার করে উঠলাম। খাড়া একশো ফুট উঠে গেছে পাথুরে দেয়াল। চুড়োর পুবদিকটা সহজেই চিনতে পারলাম। এই বিশাল ঈগলের মত চুড়োটাই বাইরে থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আমার ও মি. ইলিয়াস স্মিথের।

একরাতেই টেরর উড়ে এসেছে লেক ইরি থেকে নর্থ ক্যারোলিনায়। তারপর নেমেছে গ্রেট আইরীর মধ্যে। শক্তিশালী, দানবীয় যে পাখি আবিষ্কার করেছেন ক্যাপ্টেন, সেটার উপযুক্ত বাসস্থানই বটে। প্রকৃতির এই দুর্গম দুর্গ জয় করার সাধ্য তাঁর ছাড়া আর কারও নেই। গ্রেট আইরীর ভেতরে কোন খাদ বা সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করাও তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়। এখানে নিরাপদে টেররকে রেখে হয়তো ওই পথে বাইরে যান তিনি।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখ নিবদ্ধ পাথুরে ঈগলের ওপর। হঠাৎ প্রচণ্ড আবেগে ভেতরটা কেঁপে উঠল আমার। কপালে যা-ই থাক, কর্তব্য আগে। সুযোগ এসেছে হাতের মুঠোয়। এ সুযোগ আর ছাড়া যাবে না। মেশিনটাকে গুঁড়ো করে ফেলব আমি। সজ্ঞানে এটাকে আর ত্রাস সৃষ্টি করতে দিতে পারি না। হ্যাঁ, শেষ করে দেব এটাকে। মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ডের প্রভুত্বের সাধ মিটিয়ে দেব চিরতরে।

পেছনদিকে কে যেন হেঁটে আসছে। বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালাম। পাশে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। একটু ইতস্তত করে সরাসরি চাইলেন আমার দিকে।

নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। কথা ছিটকে বেরিয়ে এল, 'গ্রেট আইরী! এটাই গ্রেট আইরী!'

'ঠিকই ধরেছেন, ইন্সপেক্টর স্টুক।'

'আর আপনি! আপনি কে? মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড?'

'হ্যাঁ। আমিই মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড। কেন, আমি তো প্রমাণ করে দিয়েছি, পৃথিবীতে আমার চেয়ে শক্তিধর আর কেউ নেই।'

'আপনি!' বিড় বিড় করে থেমে গেলাম আমি। বিস্ময়ে হতবাক। আর কথা জোগাল না মুখে।

'আমি?' সমস্ত দম্ভ একত্রিত করে বললেন তিনি, 'আই অ্যাম রোবার। রোবার, দ্য কঙ্কারার।'

ষোলো

রোবার, দ্য কঙ্কারার! তাই তো মানুষটিকে চিনি চিনি মনে হচ্ছিল। ফিলাডেলফিয়ার ওয়েলডন ইন্সটিটিউটের অধিবেশনে চাঞ্চল্যকর উপস্থিতির পর এই অসাধারণ মানুষটির ছবিই আমেরিকার সব কয়টা কাগজে ছাপা হয়েছিল ১৩ জুন।

ছবিটা এখনও মনে গেঁথে রয়েছে আমার। সটান সোজা কাঁধ। ওস্তাদ ট্রাপিজ খেলুড়েদের মত শক্ত পিঠ। মোটা ঘাড়ের ওপর বসানো বিরাট গোল মাথা। বিপুল প্রাণশক্তির পরিচায়ক মোটা জোড়া ভ্রূর নিচে আগুনের মত গনগনে চোখ। খাটো, কোঁকড়ানো ঝকঝকে চুল। কামারের হাপরের মত ওঠা নামা করছে বিশাল বুক। উরু ও বাহুর গঠন প্রকাণ্ড শরীরের সাথে মানানসই। পরিষ্কার কামানো গালের দু'পাশে খাটো দাড়ি। ঠেলে বেরিয়ে আছে চোয়ালের শক্ত পেশী।

সেই রোবারই এখন আমার সামনে। নিজস্ব দুর্ভেদ্য দুর্গের মাঝে দাঁড়িয়ে প্রকাশ করেছেন নিজের পরিচয়।

রোবার কি করে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, সেটা একটু খুলে বলা দরকার।

ওয়েলডনের ইন্সটিটিউট আসলে অ্যারোনটিক্‌দের একটা ক্লাব। ফিলাডেলফিয়ার একজন নামী ব্যক্তি এই ক্লাবের সভাপতি। সবাই তাঁকে চেনে আঙ্কল প্রুডেন্ট নামে। মি. ফিলিপ ইভান্স এই ক্লাবের সেক্রেটারি। 'বাতাসের চেয়ে হালকা' কোন ওড়ার মেশিন আবিষ্কার সম্ভব কিনা, সেটাই ক্লাবের সব সদস্যদের চেষ্টা। ক্লাবের দুই প্রধানের তত্ত্বাবধানে তাই সবাই মিলে তৈরি করেছিলেন অতিকায় এক বেলুন। নাম—গো অ্যাহেড।

বেলুনটার নির্মাণ পদ্ধতি নিয়ে জোর আলোচনা চলছিল ক্লাবে। ঠিক সে সময় হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হন রোবার। তাঁদের সমস্ত প্ল্যানকে বাজে বলে বিদ্রূপ করেন। বলেন, বাতাসের চেয়ে ভারি মেশিনে করেই ওড়া সম্ভব। হালকা মেশিনে নয়। এবং সেরকম একটা মেশিন তিনি আবিষ্কার করেছেন।

এ কথা শুনে মুখ টিপে হাসলেন ক্লাবের সদস্যরা। পাল্টা বিদ্রূপ করে তাঁর নামকরণ করলেন—রোবার, দ্য কঙ্কারার। দিগ্বিজয়ী রোবার। একসময় গণ্ডগোল তুমুল পর্যায়ে পৌঁছল। সদস্যদের দু'একজন রিভলভার বের করে ফায়ার করতেই চম্পট দিলেন রোবার।

সেই রাতেই রোবার জোর করে নিয়ে গেলেন ক্লাবের সভাপতি ও সেক্রেটারিকে। ইচ্ছের বিরুদ্ধেই তাঁদের নিয়ে তুললেন নব আবিষ্কৃত এয়ারশীপ অ্যালব্যাট্রসে। অর্থাৎ প্রমাণ করতে চাইলেন, তাঁর ধারণা সত্যি।

যন্ত্রটা একশো ফুট লম্বা। অনেকগুলো সমতল প্রপেলার এটাকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখে। বো এবং স্টার্নে লাগানো খাড়া প্রপেলারের সাহায্যে এটা সামনের দিকে ছুটে যায়। অ্যালব্যাট্রসে আছে আধডজন ক্রু। সবাই রোবার অনুপ্রাণিত।

পৃথিবী প্রদক্ষিণ যখন প্রায় শেষ তখন মি. প্রুডেন্ট ও ইভান্স পালিয়ে যান। পালাবার আগে একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যন্ত্রটাকে ধ্বংস করে দেন। অ্যালব্যাট্রসের আবিষ্কর্তা ক্রুদেরসহ আকাশ থেকে ভীষণ বেগে পতিত হন প্রশান্ত মহাসাগরে।

মি. প্রুডেন্ট ও ইভান্স ফিরে আসেন ফিলাডেলফিয়ায়। তাঁরা জানতে পেরেছিলেন, প্রশান্ত মহাসাগরের এক্স নামক এক অজানা দ্বীপে তৈরি করা হয়েছে অ্যালব্যাট্রস। কিন্তু এই এক্স দ্বীপের অবস্থান সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হওয়ার ফলে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া, খোঁজার খুব একটা আগ্রহও ছিল না তাঁদের। কারণ মেশিনসমেত আবিষ্কর্তা ও তাঁর সহকারীরা যে সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে, এ ব্যাপারে দু'জনই নিশ্চিত।

দুই কোটিপতি বাসায় ফিরে ঠাণ্ডা মাথায় আবার গো অ্যাহেডের নির্মাণে মনোনিবেশ করলেন। অন্তরে গোপন ইচ্ছে, রোবারের সাথে যেভাবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন, সেভাবে করবেন নিজেদের মেশিনে চড়ে। প্রমাণ করে দেবেন, ভারি অ্যালব্যাট্রসের চেয়ে তাঁদের হালকা মেশিনও কোন অংশে কম নয়। আর এ কাজ করতে না পারলে তাঁরা খাঁটি আমেরিকানই নন।

পরের বছর ২০ এপ্রিল ফিলাডেলফিয়ার ফেয়ারমাউন্ট পার্ক থেকে যাত্রা শুরু করল গো অ্যাহেড। হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে আমিও সেখানে ছিলাম। বাতাসে গা ভাসিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল বিশালকায় বেলুন। শক্তিশালী প্রপেলারের দরুন সামনে পেছনেও যাতায়াত করতে পারল অনায়াসে।

হঠাৎ দর্শকদের মধ্যে ভীষণ একটা শোরগোল উঠল। আকাশের অপর প্রান্তে দেখা গেল আরেকটা মেশিন। অত্যন্ত দ্রুত সেটা এগিয়ে এল গো অ্যাহেডের দিকে। এটা আরেকটা অ্যালব্যাট্রস ! সম্ভবত প্রথমটার চেয়েও বেশি শক্তিশালী। রোবার মরেননি। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে প্রশান্ত মহাসাগরের এক্স দ্বীপে চুপি চুপি তৈরি করেছেন আরেকটা অ্যালব্যাট্রস।

অতিকায় শিকারী পাখির মত গো অ্যাহেডের ওপর ছোঁ মারল অ্যালব্যাট্রস। প্রতিশোধের আগুনে ধিকি ধিকি জ্বলছেন রোবার। প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেন না। সেই সাথে প্রমাণ করে দেবেন, বাতাসের চেয়ে ভারি মেশিন এই বেলুনের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

নিজেদের বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন মি. প্রুডেন্ট আর ইভান্স। সোজাসুজি ছুটে অ্যালব্যাট্রসের সাথে পেরে উঠবেন না বুঝতে পেরে বেলুনের সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে দিলেন। সাঁ করে গো অ্যাহেড উঠে গেল বিশ হাজার ফুট ওপরে। কিন্তু অ্যালব্যাট্রস উঠল তার চেয়ে ওপরে। চক্কর দিতে লাগল বেলুনটাকে ঘিরে।

অতর্কিতে ভেসে এল বিস্ফোরণের শব্দ। অত উঁচুতে ওঠায় প্রসারিত হয়ে গেছে গ্যাস ব্যাগ। ফাটিয়ে দিয়েছে গো অ্যাহেডকে।

অর্ধেক চুপসে গিয়ে সাঁ সাঁ করে নামতে লাগল বেলুন। এবারে ঘটল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। ঝাঁ করে নেমে এল অ্যালব্যাট্রস। তবে ওদের দু'জনকে শেষ করার জন্যে নয়। উদ্ধার করার জন্যে। প্রতিহিংসা ভুলে মি. প্রুডেন্ট ও ইভান্সকে রোবার আর তাঁর সহকারীরা মিলে টেনে তুললেন অ্যালব্যাট্রসের প্ল্যাটফর্মে। ধীরে ধীরে চুপসে গেল বেলুন। শেষমেষ এসে পড়ল ফেয়ার মাউন্ট পার্কের গাছের ওপর।

রোবারের উদারতা দেখে চমৎকৃত হলো জনসাধারণ। আবার আতঙ্কিতও হলো। এবার ওঁদের হাতে পেয়েছেন রোবার। না জানি কি করবেন। ওঁদের নিয়ে উধাও হয়ে যাবেন না তো চিরদিনের মত?

আরও নেমে এল অ্যালব্যাট্রস। মনে হলো, পার্কে এসে নামবে। কিন্তু নামলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। উত্তেজিত জনসাধারণ তাঁকে আর তাঁর যন্ত্রকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

মাটির ঠিক ছ'ফুট ওপরে এসে থেমে গেল অ্যালব্যাট্রস। জনসাধারণ এগিয়ে গেল খানিকটা। যেন আক্রমণ করবে। এই সময় শোনা গেল রোবারের গলা। আজও আমার কানে বাজছে সেই কণ্ঠ:

'হে আমেরিকান নাগরিকগণ, ওয়েলডন ইন্সটিটিউটের সভাপতি এবং সেক্রেটারি সাহেব আবার এখন আমার হাতের মুঠোয়। তাঁরা আমার বহু ক্ষতিসাধন করেছেন। সেই হিসেবে তাঁদের আটক করা আমার স্বাভাবিক অধিকারের আওতায় পড়ে। কিন্তু অ্যালব্যাট্রসের প্রতি তাঁদের এবং আপনাদের ক্রোধ ও বিদ্বেষ দেখে বুঝতে পারছি, আমার ক্ষমতাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করার মত মানসিকতা এখনও তৈরি হয়নি আপনাদের। জেনে রাখুন, আকাশ আমার করায়ত্ত। আঙ্কল প্রুডেন্ট, ফিলিপ ইভান্স, যান, আপনারা মুক্ত।'

বেলুন থেকে লাফিয়ে মাটিতে নামলেন ওঁরা। এয়ারশীপটা সাঁই করে উঠে গেল তিরিশ ফুট ওপরে। জনতার নাগালের বাইরে। আবার ভেসে এল রোবারের কণ্ঠ:

'হে আমেরিকান নাগরিকগণ, আকাশ বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে এখনই আপনাদের হাতে তুলে দেব না আমার এই আবিষ্কার। সময় আসুক। আমার আবিষ্কারের রহস্য আমি তাই সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি। এ গুপ্তরহস্য অবশ্যই একদিন আপনাদের হাতে তুলে দেব। এই মেশিন সেদিনই আপনাদের হাতে দেব, যেদিন এটা ব্যবহার করার যোগ্যতা আপনারা অর্জন করবেন। আমার এ অমূল্য আবিষ্কার আপনাদের নিছক রোষের শিকারে পরিণত হয়ে ধ্বংস হোক, তা আমি চাই না। বি-দায়!'

আরও ওপরে উঠে বোঁ বোঁ করে বাতাস কেটে চলে গেল অ্যালব্যাট্রস। সমবেত জনসাধারণ জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

রোবারের সাথে সাক্ষাতের শেষ সময়টুকুর বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দিলাম। কারণ, এতে করে পাঠক বুঝতে পারবেন রোবার কতখানি প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কারও ওপর তিনি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করেননি। অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন ভবিষ্যতের জন্যে। তবে তাঁর কথাবার্তায় প্রকাশ পেয়েছিল নিজের ক্ষমতার প্রতি প্রচণ্ড আস্থা। অতিমানবিক ক্ষমতা হাতের মুঠোয় আসার গর্বে ভেতরটা টগবগ করেছিল তাঁর।

এই ঔদ্ধত্যই ধীরে ধীরে বেড়ে গেছে। রাত দিন তাঁকে করেছে উত্যক্ত। ক্রমে ক্রমে সারা পৃথিবীকে পদানত করার বাসনা তাঁর মনে ডালপালা মেলেছে। আমেরিকান সরকারকে লেখা তাঁর চিঠি তাই প্রমাণ করে। মনের ভেতর শক্তির এই প্রচণ্ড লড়াই চলতে চলতে দারুণভাবে উত্তেজিত করে তুলেছে তাঁকে। সবরকম মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন তিনি।

অ্যালব্যাট্রসে চেপে তাঁর চলে যাবার পর কি কি ঘটেছে, খানিকটা আন্দাজ করতে পারলাম। ওইরকম একটা নিখুঁত উড়োজাহাজ তৈরি করেও শান্তি পাননি এই আবিষ্কারক। তাই তিনি প্ল্যান করলেন এমন এক যন্ত্র আবিষ্কারের যা দিয়ে শুধু আকাশপথ নয়, অন্যান্য পথও জয় করা যাবে। সম্ভবত এক্স দ্বীপের কারখানায় তিনি জড়ো করেছিলেন নিবেদিত প্রাণ কিছু কর্মী। দিন-রাত কাজ করেছে তারা। তিল তিল করে তৈরি হয়েছে একেকটা যন্ত্রাংশ, যেগুলো জোড়া দিলেই রূপ নেবে চতুর্মুখী এই অত্যাশ্চর্য মেশিন।

তারপর দ্বিতীয় অ্যালব্যাট্রস এক্স দ্বীপ থেকে এসেছে গ্রেট আইরীতে। সাথে করে বয়ে এনেছে যন্ত্রাংশগুলো। কারণ, সুদূর এক্স দ্বীপের তুলনায় গ্রেট আইরীতে কারখানা করার অনেক সুবিধে আছে। লোকালয় আছে। কোন জিনিসের প্রয়োজন হলে সেটা চট করে আনা যাবে। কিন্তু এরপর ঘটনাচক্রে গ্রেট আইরীতেই ধ্বংস হয়ে যায় অ্যালব্যাট্রস। তবে সেটাকে ইচ্ছে করে ধ্বংস করা হয়েছে, নাকি দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা জানি না।

বয়ে আনা যন্ত্রাংশগুলো একের পর এক জোড়া দেয়া হলো। জন্ম নিল অভূতপূর্ব এক মেশিন। টেরর। যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তা দিয়ে তুফানের মত ছুটে গেল টেরর। তোলপাড় তুলল আশপাশের পানিতে। তারপর কি হলো, সেটাতো আগেই বলেছি। লেক ইরিতে পিছু নিল ডেস্ট্রয়ার। দুটো ডেস্ট্রয়ারকেই কাঁচকলা দেখিয়ে টেরর গা ভাসাল শূন্যে।

সতেরো

বিস্ময়কর এই অভিযানে কি ঘটবে শেষপর্যন্ত? কখনও কি পারব এই রহস্যের জট খুলতে? সবকিছু তো রোবারের হাতের মুঠোয়!

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে পালিয়ে ছিলেন মি. প্রুডেন্ট আর মি. ইভান্স। আমি কি পারব পালাতে? আপাতত অপেক্ষা করতে হবে, যদিও জানি না, কত দীর্ঘ হবে এই অপেক্ষার পালা!

আমার কৌতূহল কিছুটা নিবৃত্ত হয়েছে, এটা ঠিক। তবে এখনও অনেক কিছু জানার বাকি। যেটুকু জেনেছি সবই গ্রেট আইরী সম্বন্ধে। প্লেজ্যান্ট গার্ডেন ও মরগ্যানটনের শহরবাসী বা আশপাশের গ্রামবাসীদের অগ্ন্যুৎপাত বা ভূমিকম্পের ভয়ে ভীত হবার কিছু নেই, এটা জানতে পেরেছি। অ্যালেঘানিতে কোন জ্বালামুখের কথা কখনও শোনা যায়নি। গ্রেট আইরীতেও কোন জ্বালামুখের সৃষ্টি হয়নি। দুর্গম এই পর্বতকে খাবারের গুদাম আর কারখানা হিসেবে ব্যবহার করেছেন রোবার। অ্যালব্যাট্রসে করে উড়তে উড়তেই বোধহয় পর্বতটা চোখে পড়েছিল তাঁর। প্রথম ঘাঁটি এক্স দ্বীপকে আজও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু গ্রেট আইরীকে নিশ্চয় এক্স দ্বীপের চেয়েও দুর্ভেদ্য বলে মনে ধরেছিল তাঁর।

অসাধারণ এই মেশিনের নির্মাণ কৌশল সম্বন্ধে কিছু জানতে পারিনি। এটা এত

জোরে চলে কি করে, জানি না তা-ও। এটা বিদ্যুতে চলে। আর সে বিদ্যুৎ বায়ুমণ্ডল থেকে আহরণ করা হয় সম্পূর্ণ নতুন কোন পদ্ধতিতে। তবে সেই পদ্ধতিটা কি, তা জানতে পারিনি। এঞ্জিনটা একনজর দেখার সুযোগ হয়নি। কখনও হবে বলেও মনে হয় না।

বন্দীদশা থেকে মুক্তির ব্যাপারটা চিন্তা করলাম। রোবার লোকচক্ষুর আড়ালেই থাকতে চান। বিশ্ববাসীর উদ্দেশে লেখা তাঁর চিঠিটার ভাষা স্মরণ করে বুঝতে পারছি, এই মেশিন দিয়ে তিনি কি করবেন। ভাল করার চেয়ে মন্দটাই করবেন অনেক বেশি। এতদিন তিনি আত্মগোপন করে থেকেছেন। ভবিষ্যতেও আত্মপ্রকাশ করবেন না বোধহয়। শুধুমাত্র একজনই জানে, মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড ও রোবার দ্য কঙ্কারার একই ব্যক্তি। সে হলাম আমি তাঁর বন্দী। কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করার অধিকার আমার আছে। আইনের স্বার্থে তাঁকে আমার গ্রেপ্তার করা উচিত।

বাইরে থেকে কেউ এসে মুক্ত করে নিয়ে যাবে, সে আশা আমি করতে পারি না। ব্ল্যাক রক ক্রীকে কি ঘটেছে, পুলিস তার সবই জানে। এই ঘটনা মিলিয়ে দুটো ধারণা করতে পারেন মি. ওয়ার্ড। এক, টেররের নোঙরে জড়িয়ে গিয়ে আমার সলিল সমাধি ঘটেছে। দুই, যেহেতু আমার লাশ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি, আমাকে টেনে তোলা হয়েছে টেররে। কমান্ডারের হাতে বন্দী হয়েছি আমি।

আমার প্রথম চিন্তা হলো, যুক্তি তর্ক দিয়ে সব ঘটনা বিচার করে জন স্ট্রক, চীফ ইন্সপেক্টর অ। ফেডারাল পুলিসের নামের শেষে 'মৃত' না লিখে উপায় নেই ওয়াশিংটন পুলিসের।

দ্বিতীয় চিন্তা, ওয়াশিংটন পুলিসের সাথীরা কি আবার আমাকে ফিরে পাবার আশা করে? নায়াগ্রা নদীতে পিছু নেয়া ডেস্ট্রয়ার দুটো জলপ্রপাতের কাছে এসে থেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তখন রাত নেমে আসছে। টেরর সবেগে ছুটে যাচ্ছে প্রপাতের দিকে। সবকিছু মিলিয়ে ডেস্ট্রয়ারের কমান্ডারদের পক্ষে কী ধারণা করা সম্ভব? নিশ্চয় এই যে, আবর্তে পড়ে চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে টেরর। জলপ্রপাতের একেবারে কিনারে এসে টেরর যে উড়ে উঠেছে এবং পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে রওনা দিয়েছে গ্রেট আইরীর দিকে, রাতের আঁধার ভেদ করে নিশ্চয় সেটা দেখা যায়নি।

রোবারকে আবার জিজ্ঞেস করব, আমাকে নিয়ে তিনি কি করতে চান? হয়তো উত্তরই দেবেন না। হয়তো আমাকে তাঁর নামটা জানিয়েই ভেবেছেন, যা কিছু বোঝার বুঝে নেব আমি।

দিন কেটে গেল। একই রকম থাকল পরিস্থিতি। বোধহয় বড়সড় মেরামতের প্রয়োজন ছিল টেররের। রোবার তাঁর দুই সাথীকে নিয়ে সারাদিন ধরে তা-ই করলেন। মনে হলো, আমাকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফের রওনা হবেন তাঁরা। তবে গ্রেট আইরীর এই অন্ধকূপে আমাকে ছেড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। খাবার দাবার যা আছে তাতে বহুদিন চলবে। কিন্তু তারপর? গ্রেট আইরী থেকে তো কোনদিনই বেরোতে পারব না।

বিশেষভাবে আমি লক্ষ করছিলাম রোবারের মানসিক অবস্থা।

উত্তেজনায় তাঁর ভেতরটা যেন টগবগ করে ফুটছে। তাঁর উর্বর মগজে কোন্

চিন্তা খেলা করছে এখন? ভবিষ্যতে কি করতে চান? এবার কোন অঞ্চলে যাবেন? উন্মাদের মত চিঠিতে যে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন, সেটাকে কি কাজে পরিণত করবেন? দেখাবেন, তিনি বাজে হুমকি দেন না?

একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে ঘাসের ওপর শুয়ে কাটল গ্রেট আইরীর প্রথম রাত। এখানেই যথাসময়ে খাবার দেয়া হলো আমাকে। ২ ও ৩ আগস্টও সারাদিনই চলল মেরামত। একদম মুখ বুজে কাজ করে গেলেন তাঁরা। এঞ্জিন পুরোপুরি মেরামত হলে মালপত্র তোলা শুরু হলো। মালপত্রের পরিমাণ দেখে মনে হলো, দীর্ঘদিন তিনি আর এখানে ফিরবেন না। হয়তো লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের সেই এক্স দ্বীপেই ফিরে যাবেন।

কখনও কখনও তিনি চিন্তায় ডুবে পায়চারি করে বেড়িয়েছেন। কখনও আবার হাত ছুঁড়েছেন আকাশপানে। ঈশ্বরকে যেন বলতে চান—পৃথিবীটা তোমার একার নয়। এতে আমারও অংশ আছে। এই মাত্রাতিরিক্ত দম্ভ কি তাঁকে ধীরে ধীরে পাগলামির দিকে ঠেলে দিচ্ছে না? এই উত্তেজনা সংক্রামিত হয়েছে তাঁর দুই সাথীর মধ্যেও। অ্যালব্যাট্রস তৈরি করেই শক্তির গর্বে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন রোবার। এখন তো সে পাগলামি আরও বাড়বে। জল-স্থল-আকাশ সর্বত্র তাঁর অবাধ যাত্রা। আর সে যাত্রায় তাঁর পিছু নেয়ার ক্ষমতা কারও নেই!

ভয়ঙ্কর সব ভবিষ্যৎ ভাবনায় ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল আমার। এখনই আমাকে নিয়ে নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়বেন রোবার। তার আগে গ্রেট আইরী থেকে পালানো অসম্ভব। সাগরে বা আকাশে যখন ছুটতে থাকবে টেরর, তখনই বা পালাব কি করে? পালাবার একমাত্র আশা আছে, যদি টেরর যায় রাস্তা দিয়ে আর যায় আস্তে। কিন্তু সে আশা বোধহয় সুদূর পরাহত।

প্রথমদিন গ্রেট আইরীতে রোবারের সাথে কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলাম। আজ আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে হবে।

বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দাঁড়ালাম বড় গর্তটার সামনে। এখনও কিছু ঠুকঠাক চলছে এখানে। গর্তের মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেন রোবার। আমি যেতেই চোখ তুলে দেখলেন। তাহলে কি আমার সাথে কথা বলতে চান?

একেবারে মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, 'ক্যাপ্টেন, আপনাকে কিন্তু একটা প্রশ্ন করেছিলাম। জবাব দেননি। আবার বলছি, ঠিক করে বলুন তো, আমাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কি করবেন?'

আমাদের মধ্যে দু'ধাপের ব্যবধানও হবে না। জ্বলন্ত চোখে কটমট করে তাকালেন আমার দিকে। তাকানোর ভঙ্গিটা সুস্থ মানুষের মত নয়। অমানুষিক সে দৃষ্টি!

কড়া গলায় আবার করলাম প্রশ্নটা। এবার মনে হলো, নীরবতা ভেঙে কথা বলে উঠবেন তিনি।

'আমাকে নিয়ে কি করতে চান আপনি? আমাকে ছেড়ে দেবেন?'

কি যেন চিন্তায় মগ্ন ছিলেন তিনি। আমার প্রশ্নে তাঁর চিন্তায় যেন একটু ছেদ পড়ল। এর বেশি কিছু না। আবার সেই একই ভঙ্গি করলেন। একটা হাত ছুঁড়লেন আকাশের দিকে। মনে হলো, আকাশ যেন তাঁকে টানছে। মাটির সাথে যেন

সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে চলে যাবেন শূন্যে। চিরদিনের মত আস্তানা গাড়বেন মেঘের রাজ্যে।

এবারও জবাব দিলেন না রোবার। ভাবসাব দেখে মনে হলো, প্রশ্নটাই যেন বোঝেননি। ফের তিনি ঢুকে পড়লেন সুড়ঙ্গের মধ্যে।

গ্রেট আইরীতে আরও কতক্ষণ থাকবে টেরর, জানি না। তবে ৩ আগস্ট বিকেলবেলা মেরামত সারা হলো। পাট চুকল মালপত্র তোলারও। এত বেশি মালপত্র তোলা হলো, টেররের ভেতরটা বোধহয় ভরে গেল।

রোবারের দুই সাথীর প্রধান এবার শুরু করল আরেক কাজ। ওর নাম জানতে পেরেছিলাম আমি: জন টার্নার। দু'জন মিলে বাড়তি মালপত্র এনে জড়ো করতে লাগল গর্তটার মাঝখানে। খালি বাক্স, কাঠের কুচি আর অদ্ভুত আকারের কিছু কাঠের টুকরো। এগুলো নিশ্চয় অ্যালব্যাট্রসের। জড়ো করা জিনিসপত্রগুলোর তলায় বেশ কিছু শুকনো ঘাস। সন্দেহ হলো, রোবার বোধহয় চিরদিনের জন্যে ছেড়ে যাচ্ছেন গ্রেট আইরী।

জনসাধারণের চোখ পড়েছে গ্রেট আইরীর ওপর, এটুকু না বোঝার মত বোকা রোবার নন। প্রথমবার এখানে ওঠার অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। এবার তো ব্যর্থ না-ও হতে পারে। যদি সত্যি সত্যিই পুলিশের লোক এখানে ঢুকতে পারে, তাহলে তাঁর গোপন ঘাঁটির কথা ফাঁস হয়ে যাবে। সুতরাং তাঁর কর্মকাণ্ডের কোন সূত্র রাখবেন না তিনি। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবেন।

ব্লুরিজের চূড়ায় সূর্য অস্ত গেল। উত্তর-পশ্চিমে ব্লাকডোমের মাথায় শুধু দেখা যাচ্ছে তার শেষ রশ্মিটুকু। টেরর সম্ভবত রাতের অপেক্ষা করছে। এটা মোটর, জাহাজ বা ডুবোজাহাজ হতে পারে, তা সবাই জানে। কিন্তু এটা যে উড়তেও পারে, সেটা পৃথিবীর কেউই জানে না। কেউ এটাকে আকাশে উড়তে দেখেনি। টেররের উড়োজাহাজের পরিচয়টা সতর্কতার সাথে গোপন রেখেছেন মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড। হয়তো অপেক্ষা করছেন সেই দিনটির, যেদিন আত্মপ্রকাশ করে থরহরি কম্প ধরাবেন সারা পৃথিবীর। আসলে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন রোবার।

রাত নটার দিকে নিকষ কালো আঁধারে ছেয়ে গেল সারা গর্ত। তারার আলো পর্যন্ত অদৃশ্য। তীব্র পূবালী বাতাসের টানে ছুটে চলেছে রাশি রাশি মেঘ। ছেয়ে ফেলছে সারা আকাশ। এখন লুকিয়ে উড়ে যেতে পারবে টেরর। প্রতিবেশী অঞ্চল তো দূরের কথা, সারা আমেরিকা এমন কি সাগর থেকেও কেউ এটাকে দেখতে পাবে না।

এইসময় এগিয়ে এল টার্নার। গ্রেট আইরীর মাঝখানের স্তূপীকৃত জঞ্জালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আগুন ধরিয়ে দিল শুকনো ঘাসে।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। রাশি রাশি ধোঁয়া আর লেলিহান অগ্নিশিখা উঠে গেল গ্রেট আইরীর চুড়ো ছাড়িয়ে। মরগ্যানটন আর প্লেজ্যান্ট গার্ডেনের সরল মানুষেরা আবার ভয় পাবে এই আগুন দেখে। আতঙ্কিত হবে অগ্ন্যুৎপাতের চিন্তায়।

আমি চেয়ে রইলাম সেই প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের দিকে। আগুনের পটপট আর কাঠ ফাটার শব্দে আকাশ বাতাস মুখর। টেররের ডেক থেকে রোবারও চেয়ে আছেন

আগুনের দিকে।

টার্নার তার সাথীকে নিয়ে আশপাশে পড়ে থাকা টুকরো-টাকরাগুলোও এনে ফেলছে আগুনে। একসময় আগুন মিইয়ে এল। জোনাকীর মত জ্বলজ্বল করতে লাগল শুধু পোড়া ছাই। তারপর সেটাও নিভে গেল। চারদিক নিস্তব্ধ। আবার কালো ডানায় গ্রেট আইরীকে ঢেকে নিল অন্ধকার।

হঠাৎ কে যেন টান দিল হাত ধরে। টার্নার আমাকে টেনে নিয়ে চলল টেররের দিকে। বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। আর লাভ যদি হয়ও তাতে আমারই ক্ষতি। আমাকে যদি ছেড়ে চলে যায় ওরা তাহলে সর্বনাশ।

আমার সাথে টার্নারও উঠে পড়ল ডেকে। ওর সাথী গিয়ে দাঁড়াল সামনে। টার্নার নেমে গেল এঞ্জিন রুমে। বৈদ্যুতিক বাল্বের আলোয় ঝকমক করছে এঞ্জিন রুম।

রোবার নিজে গিয়ে ধরলেন হাল। গতিবেগ ও দিক নিয়ন্ত্রণের জন্যে হাতের কাছেই রইল রেগুলেটর। আমাকে নামিয়ে দেয়া হলো কেবিনে। মাথার ওপর বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচ। নায়াগ্রা থেকে ওড়ার পর টেরর কিভাবে উড়ছে, সেটা আমাকে দেখতে দেয়া হয়নি। আজও ঘটল সেই একই ঘটনা।

ডেকের ওপর কে চলাফেরা করছে, বুঝতে পারছি না। তবে যন্ত্রপাতি চলার শব্দ পাচ্ছি। প্রথমে মনে হলো উঁচু হয়ে উঠল বো-র দিকটা। তারপর কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দুলে যেন ভারসাম্য বজায় রাখতে লাগল। তারপর বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল টারবাইন। ঝটপট শব্দ ভেসে এল বিশাল ডানাজোড়ার।

সম্ভবত চিরদিনের মত গ্রেট আইরী ছেড়ে চলল টেরর। অ্যালেঘানি পর্বতমালার ওপর দিয়ে নিশ্চয় উড়ে যাবেন ক্যাপ্টেন। আশপাশের পাহাড়ী অঞ্চল না ছাড়া পর্যন্ত অনেক উঁচু দিয়েই উড়তে থাকবেন।

কিন্তু তিনি যাবেন কোন্ দিকে? নর্থ ক্যারোলিনার ওপর দিয়ে উড়ে যাবেন আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে? নাকি পশ্চিম দিকে উড়ে গিয়ে পৌঁছবেন প্রশান্ত মহাসাগরে? সম্ভবত দক্ষিণে উড়ে তিনি যাবেন মেক্সিকো উপসাগরে। কিন্তু দিনের বেলা চোখ মেলে যদি দেখি চারদিক দিগন্ত ছোঁয়া শুধু পানি আর পানি, তাহলে কেমন করে বুঝব সেটা কোন্ সাগর?

তিল তিল করে কেটে গেল কয়েকটা ঘণ্টা। ঘুমোবার কোন চেষ্টা করলাম না। আজব, অবাস্তব সব কল্পনা ভিড় করে এল। রীতিমত ভাসতে লাগলাম কল্পনার সাগরে। যে গতিতে উড়ে চলেছে টেরর, জানি না অসীম এ রাতের শেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে।

আবার মনে পড়ল অ্যালব্যাট্রসের সেই অবিশ্বাস্য অভিযানের কথা। এ সম্বন্ধে মি. প্রুডেন্ট ও মি. ইভান্সের একটা বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছিল ওয়েলডন ইন্সটিটিউট থেকে। প্রথমবারই যে কাণ্ড করেছিলেন রোবার, এবার অ্যালব্যাট্রসের চেয়ে অনেক শক্তিশালী চতুর্মুখী এই মেশিন নিয়ে না জানি কি কাণ্ডই করবেন।

অবশেষে আমার কেবিনে প্রবেশ করল প্রথম ঊষার আলো। ডেকে গিয়ে কি দাঁড়াতে দেবে ওরা? লেক ইরিতে তো দিয়েছিল।

হ্যাচ ধরে ঠেলা দিলাম। খুলে গেল। কোমর পর্যন্ত বের করে আনলাম ডেকের

ওপর।

আকাশ আর সাগর ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না। একটা মহাসাগরের একহাজার কি বারোশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ছি আমরা। রোবারকে দেখতে পেলাম না। বোধহয় এঞ্জিন রুমে আছেন। হাল ধরে আছে টার্নার। অন্য লোকটা বো-তে দাঁড়িয়ে নজর রাখছে চারদিকে।

গতবারের নৈশ অভিযানের কিছুই দেখতে পাইনি। এবার পেলাম। একই সাথে ওঠানামা করছে দুই ডানা। ওদিকে বন বন করে ঘুরে চলেছে প্রপেলার।

দিগন্ত ছেড়ে কিছুটা উঠে এসেছে সূর্য। সেই হিসেবে আন্দাজ করলাম, আমরা চলেছি দক্ষিণে। রাতের বেলা টেরর যদি দিক পরিবর্তন না করে থাকে তবে আমাদের নিচের এটা মেক্সিকো উপসাগর।

দিগন্ত জুড়ে ঝুলে আছে সীসে রঙের ভারি মেঘ। একটা গরম দিন ও ঝড়ের সঙ্কেত। আটটার দিকে ডেকে এলেন রোবার। টার্নারের হাত থেকে হালের ভার নেয়ার সময় এইসব চিহ্ন তাঁরও দৃষ্টি এড়াল না। ঘনীভূত মেঘ দেখে তাঁর বোধহয় মনে পড়ল অ্যালব্যাট্রসের কথা। একবার জলস্তম্ভের মধ্যে পড়ে অল্পের জন্যে ধ্বংস হয়নি অ্যালব্যাট্রস। আরেকবার অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন দক্ষিণ মেরু সাগরের ঘূর্ণিঝড়ের কবল থেকে।

প্রকৃতির শক্তির কাছে অ্যালব্যাট্রস হার মানলেও টেরর মানবে না। কারণ এই মেশিন অনেক হালকা এবং বহুরূপী। আকাশে তুমুল ঝড় বৃষ্টি শুরু হলে এটা নেমে আসতে পারবে সাগরে। ঢেউ যদি বেশি হয়, ডুব দিয়ে চলে যেতে পারবে শান্ত পানিতে।

আকাশের অবস্থার সাথে নিজের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে রোবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন, আগামীকালের আগে ঝড় আসবে না।

তাই ওড়া অব্যাহত রইল। বিকেলের দিকে সাগরের ওপর নেমে এল টেরর। খারাপ আবহাওয়ার চিহ্ন আর নেই এখন। টেরর সত্যিই সামুদ্রিক পাখি অ্যালব্যাট্রস কিংবা শঙ্খচিলের মত অনায়াসে ভেসে থাকতে পারে পানির ওপর। অফুরান বিদ্যুৎচালিত এই ধাতব পাখি কখনও ক্লান্ত হয় না।

খাঁ খাঁ করছে চারপাশে সাগর। দিগন্ত জুড়ে কোথাও দেখা যাচ্ছে না একটা পাল বা ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আকাশপথে ওড়ার সময় কেউ আমাদের দেখতে পায়নি। পাঠায়নি কোন সঙ্কেত।

স্বাভাবিক গতিতে ছুটে চলেছে টেরর। ক্যাপ্টেনের মনোভাব এখনও বুঝতে পারছি না। দিক পরিবর্তন না করলে আমরা পৌঁছব ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা আরও খানিকটা এগিয়ে উপসাগরের শেষ প্রান্তে। ভেনিজুয়েলা বা কলাম্বিয়ার উপকূলে। কিন্তু রাতে নামলে বোধহয় আবার উড়বে টেরর। গুয়াতেমালা আর নিকারাগুয়ার পর্বতমালা পেরিয়ে পৌঁছবে প্রশান্ত মহাসাগরের সেই অজানা এক্স দ্বীপে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। রক্তের মত লাল টকটকে দিগন্তে ডুবে গেল সূর্য। ছিটে ফোঁটা রশ্মিতে চারপাশের সাগর ঝিকমিক করতে লাগল। ঝড়ের লক্ষণ। ক্যাপ্টেনও নিশ্চয় সেটা বুঝতে পেরেছেন। আবার আমাকে জোর করে নামিয়ে দেয়া হলো কেবিনে। মাথার ওপরে বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচ।

কিছুক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রকম শব্দে বুঝলাম, ডুব দিতে যাচ্ছে টেরর। মাত্র পাঁচ মিনিটের মাথায় টেরর সাগরের তল দিয়ে খুব শান্তভাবে এগিয়ে চলল।

শরীর যেন ভেঙে পড়ল আমার। শরীরের এ অবস্থা হলো যতটা না ক্লান্তিতে, তার চেয়ে বেশি উত্তেজনা আর আজগুবি চিন্তায়। গভীর ঘুমে অভিভূত হয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ পর ঘুম ভাঙল। টেরর তখনও পানির নিচ দিয়ে চলেছে।

একটু পরই ভেসে উঠল। পোর্টহোল দিয়ে ঢুকে পড়ল দিনের আলো। অনুভব করলাম, ভীষণভাবে হেলছে দুলছে লাফাচ্ছে টেরর। সাগর অশান্ত হয়ে উঠেছে।

হ্যাচওয়ে দিয়ে আবার বেরিয়ে এলাম ডেকে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম আবহাওয়ার অবস্থা। উত্তর-পশ্চিম থেকে ধেয়ে আসছে একটা ঝড়। কালো মেঘের বুক চিরে ঝলসে উঠছে বিদ্যুতের ফলা। গুড়ু গুড়ু শব্দে ডাকছে মেঘ। ভয় পেলাম। আকাশে এখনই শুরু হবে ঝড়ের মত্তলীলা। এত জোরে ধেয়ে আসছে ঝড় যে, পাল গুটিয়ে নেয়ার সময়ও পাবে না কোন জাহাজ।

রুদ্র মূর্তিতে প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝড়। ফুঁসে উঠল সাগর। ভীষণ শব্দে ঢেউ ভাঙতে লাগল। ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা। আছড়ে পড়তে লাগল টেররের ওপর। শক্ত হাতে গরাদ চেপে ধরার জন্যে রক্ষা পেলাম। নইলে খড়কুটোর মত আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পানিতে ফেলত।

প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলার হাত থেকে বাঁচার একটাই মাত্র উপায় আছে। আবার সাগরের গভীরে ডুব দেয়া। কয়েক ডজন ফুট নিচে নামলেই পাওয়া যাবে শান্ত পানি। মত্ত সাগরের সাথে লড়াই করা অসম্ভব।

রোবার ডেকে আছেন। প্রতি মুহূর্তে ভাবছি, এই বুঝি আবার আমাকে নামিয়ে দেয়া হবে কেবিনে। কিন্তু কেউ সে চেষ্টা করল না। ডুব দেয়ার তোড়জোড়ও দেখা গেল না। ঝড়ের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে আরও জ্বলজ্বল করতে লাগল রোবারের চোখ। যেন ঝড়কে চ্যালেঞ্জ করছেন। কারণ তিনি ভাল করেই জানেন, পৃথিবীর কোন কিছুতেই ভয় পাবার কিছু নেই তাঁর।

কালবিলম্ব না করে ডুব দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু রোবারের হাবভাবে সেরকম কোন লক্ষণ দেখছি না। বরং প্রচণ্ড ঔদ্ধত্যে চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। তিনি যেন এ পৃথিবীর মানুষ নন। ধরা ছোঁয়ার বাইরের কোন জীব।

তাঁর চেহারা দেখে কুসংস্কার ভর করল আমার ওপর। মনে হলো, রোবার যেন অলৌকিক জগৎ থেকে পালিয়ে আসা এক দানব।

চিৎকার করে উঠলেন তিনি। প্রচণ্ড ঝড় আর বজ্রের গর্জন ছাপিয়ে শোনা গেল সেই কণ্ঠ।

'আই অ্যাম রোবার। রোবার। মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড!'

এ কথা বলেই এমন একটা ভঙ্গি করলেন যার অর্থ বুঝল তাঁর দুই সাথী। বিকৃত মস্তিষ্ক রোবারের সাথে থেকে থেকে ওই দু'জনের মাথাতেও যেন উন্মাদনা ভর করেছে। প্রভুর আদেশ পালনের জন্যে উদ্যত হলো তারা।

খুলে গেল দু'পাশের দুই ডানা। উড়ে উঠল টেরর। নায়াগ্রার একেবারে কিনারায় গিয়ে উড়ে উঠেছিল টেরর। অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছিল সেদিন। কিন্তু আজ পাগলের মত ছুটল সোজা হ্যারিকেনের দিকে।

শোঁ শোঁ করে উড়ে চলল টেরর। চারপাশে অজস্র ঝলকানি। বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। তীরের মত ঝলসে ওঠা আলোর মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে টেরর। যে কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে চরম দুর্ঘটনা।

বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি রোবারের হাবভাব। একহাতে হাল, আরেক হাতে স্পীড রেগুলেটর ধরে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন। ঝাপঝপ পড়ছে দুপাশের ডানা। টেরর ছুটে যাচ্ছে ঝড়ের ঠিক মাঝখানে। মেঘে মেঘে খেলে যাচ্ছে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ।

এখনই এই উন্মাদকে আমার বাধা দেয়া উচিত। বন্ধ করা উচিত এই উন্মত্ত অভিযান। নামাতে বাধ্য করা উচিত সাগরে। না। শুধু সাগরে নামলেও চলবে না। ফুঁসছে ঢেউ। ডুব দিতে হবে পানির অতলে। ভয়ঙ্কর এই ঝড় একবারে থেমে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

উত্তেজনা আর আবেগে ভেতরটা কাঁপছে আমার। তবু, তার মধ্যেও মাথাচাড়া দিল কর্তব্যবোধ। কোন সন্দেহ নেই, উন্মাদ হয়ে গেছেন রোবার। শুধুমাত্র একটা মেশিনের বলে তিনি হুমকি দিয়েছেন সারা বিশ্বকে। তিনি আউট-ল। সুতরাং আইনের স্বার্থে, পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের স্বার্থে আমার উচিত এখনই এই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা। তাঁর কাঁধ চেপে ধরে বলা উচিত, 'এখনই আত্মসমর্পণ করুন।'

আমি স্টক, ফেডারাল পুলিসের চীফ ইন্সপেক্টর, সে কথা তো ভুলে গেলে চলবে না। মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেলাম আমি একা আর প্রতিপক্ষ তিনজন। ভুলে গেলাম আমি কোথায় আছি। আমি যে সাগরের অনেক ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি, চারপাশে মুহুর্মুহু বজ্রপাত হচ্ছে, সব ভুলে গেলাম। মাথায় শুধু একটাই চিন্তা। কর্তব্য। লাফিয়ে এগোলাম স্টার্নের দিকে। প্রচণ্ড ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'আইনের স্বার্থে আমি আপনাকে—'

তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়লাম রোবারের ওপর।

হঠাৎ ভীষণভাবে কেঁপে উঠল টেরর। যেন প্রচণ্ড শক লেগেছে। বৈদ্যুতিক শক খেলে মানুষ যেমন কেঁপে ওঠে, তেমনিভাবে কেঁপে উঠল গোটা টেরর। শক্তিশালী ব্যাটারির ঠিক মাঝখানে আঘাত হেনেছে বিদ্যুৎ। মুহূর্তের মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল উড়োজাহাজ।

ডানা দুটো খুলে পড়ল। প্রপেলারগুলো ভেঙে গেল। সেই ভাঙা টেররের ওপরেই একের পর এক বজ্র আছড়ে পড়তে লাগল। হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতা থেকে টেররের ধ্বংসাবশেষ এসে পড়ল নিচের সাগরে।

আঠারো

অনেক পর জ্ঞান ফিরল আমার। দেখলাম, শুয়ে আছি একটা কেবিনে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কিছু নাবিক। বুঝলাম, এরাই উদ্ধার করেছে আমাকে। মাথার বালিশের পাশে বসে আছেন একজন অফিসার। আমাকে চোখ মেলতে দেখে

প্রশ্ন করতে লাগলেন তিনি। মাথাটা একটু পরিষ্কার বোধ হতে যথাসাধ্য জবাব দিলাম।

গোড়া থেকে সবকিছুই খুলে বললাম। কোন কথাই বাদ দিলাম না। কিন্তু ওদের চোখ মুখ আমাকে বলে দিল, আমার কথা বিশ্বাস করছে না ওরা। হয়তো ভেবেছে, পুরো জ্ঞান এখনও ফেরেনি আমার। ভুল বকছি।

আমি শুয়ে আছি 'অটোয়া' স্টীমারে। স্টীমারটা মেক্সিকো উপসাগরের ওপর দিয়ে চলেছে নিউ অর্লিন্সের দিকে। যে ঝড়ের কবলে পড়ে টেরর ধ্বংস হয়েছে, সেই ঝড়ের ভয়েই পালাচ্ছিল অটোয়া। সেই সময় তাদের চোখে পড়ে টেররের ধ্বংসাবশেষ। আর সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আটকে থাকা আমার দেহ।

আবার তাহলে পৃথিবীর মানুষের মাঝে ফিরে এসেছি আমি। রোবার দ্য কঙ্কারার আর তাঁর দুই সাথীর দুঃসাহসিক জীবনের অবসান হয়েছে উপসাগরের পানিতে। নিজের শক্তিতে উন্মাদ মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড লড়াই করতে গিয়েছিলেন বিদ্যুতের বিরুদ্ধে। ফলে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হলো তাঁকে। তাঁর অসাধারণ সেই মেশিনের রহস্যটা মানুষের কাছে রহস্যই থেকে গেল।

পাঁচদিন পরে চোখে পড়ল লুসিয়ানার উপকূল। ১০ আগস্ট অটোয়া বন্দরে ভিড়ল। নাবিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চেপে বসলাম ওয়াশিংটনের ট্রেনে। মনের মধ্যে অন্যরকম এক অনুভূতির খেলা। আবার কখনও ওয়াশিংটন ফিরতে পারব, এ আশা তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।

ওয়াশিংটন পৌঁছেই প্রথম গেলাম পুলিস ব্যুরোতে। আমি যে ফিরে এসেছি, সেটা সবচেয়ে আগে জানানো দরকার মি. ওয়ার্ডকে।

আমাকে দেখে চমকে উঠলেন চীফ। বিস্ময়ে, আনন্দে একেবারে বোবা বনে গেলেন। আমার সাথীদের রিপোর্ট পেয়ে তিনি প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন, আমার মলিল সমাধি হয়েছে লেক ইরিতে।

সব খুলে বললাম তাঁকে। হ্রদে ডেস্ট্রয়ারের তাড়া, নায়াগ্রা জলপ্রপাতের একেবারে কিনারে গিয়ে টেররের উড়ে ওঠা, গ্রেট আইরীর গহ্বরে নামা মেক্সিকো উপসাগরের মারাত্মক ঝড়—কিছুই বাদ দিলাম না।

রোবারের অসাধারণ মেশিনটা যে শুধু জলে-স্থলেই নয়, আকাশেও চলতে পারত, সেটা এই প্রথম শুনলেন তিনি।

সত্যি কথা বলতে কি, এরকম একটা মেশিন যাঁর দখলে, তিনি মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড নাম নিলে খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। তাঁর এই একটামাত্র মেশিন ছিল পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্যে হুমকি স্বরূপ। এই মেশিনের বিরুদ্ধে সবরকম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই হাস্যকর।

কিন্তু শক্তি গর্বে উন্মাদ হয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েই নিজের ধ্বংস ডেকে আনলেন রোবার। এরকম একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা এড়িয়ে আমার বেঁচে যাওয়াটা রীতিমত অলৌকিক ব্যাপার।

ঘটনাগুলো এতই আশ্চর্যজনক, আমার মুখে শুনেও যেন বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ল মি. ওয়ার্ডের।

শেষমেষ বললেন, 'যাক সেসব কথা। তুমি ফিরে এসেছ, এটাই সবচেয়ে বড়

কথা, স্ট্রক। কুখ্যাত এই রোবার এতদিন ছিল বিশ্ববিখ্যাত। এবার বিখ্যাত হতে চলেছ তুমি। দেখো, প্রশংসায় মাথা গরম করে ওই পাগল বৈজ্ঞানিকের মত তুমিও আবার পাগল হয়ে যেও না।'

'সেরকম কিছু হবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন, স্যার। তবে এটা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, ইতিপূর্বে কোন মানুষ কৌতূহল মেটাতে গিয়ে এভাবে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েনি।'

'হ্যাঁ। গ্রেট আইরীর রহস্য, টেররের রূপান্তর রহস্য সবই উদ্‌ঘাটন করেছ তুমি। তবে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবার সময় মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড তাঁর মেশিনের রহস্যটাও সাথে করে নিয়ে গেলেন, এটাই যা দুঃখের কথা।'

সেদিনই সান্ধ্য দৈনিকগুলোতে সবিস্তারে প্রকাশিত হলো আমার অভিযানের কাহিনী। চীফ ঠিকই বলেছিলেন। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলাম আমি।

একটা কাগজে লেখা হলো, 'ইন্সপেক্টর স্ট্রককে জানাই আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন। তিনি প্রমাণ করে দিলেন, এখনও আমেরিকার পুলিসই পৃথিবীর সেরা। অন্য পুলিসেরা জলে-স্থলে সামান্য সাফল্য লাভ করেছিল। কিন্তু আমেরিকান পুলিস অপরাধীকে শুধু হ্রদে বা মহাসাগরের তলে তাড়া করেই ক্ষান্ত হয়নি। তাড়া করেছে আকাশপথেও।'

ভাবলাম, টেররের পেছনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলাম আমি। ভবিষ্যতের ইন্সপেক্টররাও প্রয়োজন দেখা দিলে তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়বে তো?

লং স্ট্রীটের বাড়িতে পৌছতে বুড়ির অবস্থা কি হলো তা সহজেই অনুমেয়। প্রথমটায় তার চোখ মুখ দেখে মনে হলো, সে আমাকে জীবিত ভাবছে না। ভাবছে, আমি প্রেতাত্মা হয়ে ফিরে এসেছি। ভয় হলো, বেচারী বুড়ি না আবার হার্টফেল করে বসে!

সব কথা খুলে বললাম বুড়িকে। রোমহর্ষক সে কাহিনী শুনতে শুনতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সে। এত ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও আমি যে সুস্থ দেহে ফিরে এসেছি, সেজন্যে বারবার কৃতজ্ঞতা জানাল ঈশ্বরকে।

'এবার বলুন, স্যার,' বলল সে, 'আমি কি বাজে কথা বলেছিলাম?'

'বাজে কথা? কিসের বাজে কথা?'

'বলেছিলাম না, গ্রেট আইরীতে শয়তানেরা আড্ডা গেড়েছে?'

'চুপ করো! তুমি একটা বেকুব। রোবার কি শয়তান? সে তো মানুষ।'

আমার এ কথায় বিপদে পড়ে গেল বুড়ি। বুঝতে পারছিল, আমি ঠিক কথাই বলেছি। কিন্তু বুড়ি হার মানার পাত্রী নয়।

আমতা আমতা করে বলল, 'তা ঠিক, তা ঠিক। তবে শয়তান হবার যোগ্যতা তার ছিল।'

****